মে দিবস প্রতিপালিত

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

৪ মে নবান্ন অভিযান

একাদশ-দ্বাদশ সংস্করণ, মার্চ-এপ্রিল, ২০২৩ ● ৫০তম বর্ষ ● মূল্য ২ টাকা

দশম পঞ্চায়েত নির্বাচন ২০২৩

প্রতিষ্ঠিত হোক গণতন্ত্র, জনগণের অধিকার

যৌথ আন্দোলন ও আশু সংগ্রাম

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

সাধারণ সম্পাদক,
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

সংগ্রাম-আন্দোলন বা সংগঠন পরিচালনায় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা বা বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। চলার পথে এটা খুবই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এর থেকে উত্তোরণ অতীত শিক্ষন থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে অতীতের শিক্ষা সবসময়েই গ্রহণীয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে অতীত পরিস্থিতির হুবহু অনুকরণ। বর্তমান পরিস্থিতি গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে অতীত অভিজ্ঞতাকে সমন্বিত করেই আগামীর পথ নির্ধারণ করতে হয়।

শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতির ইতিহাস নানান মতভেদের মধ্য দিয়েই এগিয়েছে। এটা হওয়াই স্বাভাবিক কারণ মতভেদের চিরন্তন উৎস হল সামাজিক বিকাশের দ্বান্দ্বিক চরিত্র, যা এগোয় বিরোধিতা ঘটিয়ে ও বিরোধিতার মধ্য দিয়ে এই মতভেদ ঘটার গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল সাধারণভাবে শ্রমিক শ্রেণিগুলির বিশেষ করে বুর্জোয়াশ্রেণির প্রতিনিয়ত কৌশল পরিবর্তন। বুর্জোয়া কৌশল সব সময় এক থাকলে শ্রমিকশ্রেণিও সমপ্রকৃতির কৌশল দিয়ে চট করে জবাব দিতে শিখে যেত। বুর্জোয়ারা নিজেদের স্বার্থেই দুটি প্রথা গড়ে তোলে নিজের স্বার্থের জন্য লড়াই ও নিজের প্রতিপত্তি রক্ষা। প্রথম পদ্ধতি হল বলপ্রয়োগের পদ্ধতি শ্রমিক আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার না করার পদ্ধতি। দ্বিতীয় পদ্ধতি উদারনীতিকদের পদ্ধতি অর্থাৎ রাজনৈতিক অধিকার বৃদ্ধি, সংস্কার আইন, ছাড়, দান ইত্যাদির দিকে পদক্ষেপের পদ্ধতি ।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে যখন

● *ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে*

জয়ী হবে জনগণ

সুমিত ভট্টাচার্য

যুগ্ম আহ্বায়ক,
১২ জুলাই কমিটি

রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের কর্মকাণ্ড ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। ৮ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন। কাকতালীয় হলেও, রাজ্য নির্বাচন কমিশন এমন একটা দিন নির্বাচনের জন্য ধার্য করেছে, যে দিনটি এই রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রিয়, ধর্মনিরপেক্ষ ও বিশেষত বাম-মনস্ক মানুষের কাছে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই দিনটিই (৮ জুলাই) রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, জননেতা জ্যোতি বসুর জন্মদিবস। তাঁর নেতৃত্বেই বামফ্রন্ট সরকারের সক্রিয় উদ্যোগে প্রচলিত পঞ্চায়েত আইনের সংশোধন করে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। গ্রামের জমিদার-জোতদার তথা বাস্তুঘুঘুদের বাসা ভেঙ্গে মানুষের পঞ্চায়েত মাথা তুলে দাঁড়ায়। ১৯৭৭ সালের ২১ জুন প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করে জ্যোতি বসু ঘোষণা করেছিলেন, রাজ্য প্রশাসন শুধুমাত্র রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে পরিচালিত হবে না। পঞ্চায়েত, পৌরসভার মতন আঞ্চলিক স্বয়ংশাসিত সংস্থার মাধ্যমে বিকেন্দ্রীভূত উন্নয়নের এক নয়া মডেল গড়ে তোলা হবে। গণতন্ত্র সম্প্রসারিত হবে প্রান্তিক মানুষের দোরগোড়া পর্যন্ত।

এবং ঘটেছিলও তাই। জমিদার-জোতদারদের পায়ের তলায় পিষে থাকা গ্রামীন দরিদ্র মানুষ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়িয়েছিলেন। সামাজিক ক্ষমতার ভরকেন্দ্রটাও গেছিল পাল্টে। যেকোন কারণে পঞ্চায়েতের শংসাপত্রের প্রয়োজন হলে জমিদারবাবু অথবা তার মোসাহেবকে গ্রাম পঞ্চায়েত অথবা পঞ্চায়েত

● *তৃতীয় পৃষ্ঠার প্রথম কলমে*

নির্বাচন কমিশনকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির চিঠি

স্মারক সংখ্যা ঃ কো-অর্ডি ১০৯/২০

মাননীয় রাজ্য নির্বাচন কমিশনার
পশ্চিমবঙ্গ

মহাশয়,

আপনি নিশ্চিতভাবে অবহিত আছেন যে আসন্ন বিশ্বনীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলির ও অন্যান্য নির্বাচনী প্রার্থীদের নমিনেশন পর জন্ম দেওয়াকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রশ্নে ইতোমধ্যে বেশ কিছু অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে। এমনকি নির্বাচন কর্মী হিসেবে কর্তব্যরত কর্মচারীরাও এই আক্রমণ থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। অথচ নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী প্রশাসনের আধিকারিকসহ কর্মচারীরা সমস্ত স্তরের প্রাক-প্রস্তুতিমূলক কর্মকান্ডসহ নির্বাচনের সময় কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আপনারা নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত থাকেন।

অতীতে রাজ্য প্রশাসনের অভারে কর্মচারীরা নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী অবাধ নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু নির্বাচন কাজ পরিচালনা করেছেন, যা কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন যারা বারংবার প্রশংসিত হয়েছে।

কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে অনুষ্ঠিত কয়েকটি নির্বাচনে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে নির্বাচনী দপ্তরগুলিতে সরকারী কর্মচারীদের নির্বাচনী কাজে যুক্ত করার ক্ষেত্রে পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাবের দৃষ্টিভঙ্গী পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে মাপকাঠি হিসাবে ঠিক করা হচ্ছে, কর্মচারীদের সাংগঠনিক আনুগত্যকে যা আমাদের কাছে অনভিপ্রেত ও ভয়াবহ।

রাজ্যে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করেও উপরোক্ত পক্ষপাতিত্বের নিদর্শন লক্ষ্য করা গেছে। একাংশের আধিকারিকসহ কর্মচারীরা নিষ্ঠার সাথে নির্বাচনী কাজ পরিচালনা করতে দিয়ে রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতিদের দ্বারা নৃশংসভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন। ভালো কর্মচারীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়েই নির্বাচনী কাজ পরিচালনা করতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলস্বরূপ, কর্মচারীদের পরিবারের মধ্যেও আতঙ্ক ভয়ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। প্রশাসনের কাছ থেকে সুরক্ষা সম্পর্কে কোনরূপ নিশ্চয়তা বা প্রতিশ্রুতি না পাওয়ায় প্রশাসনের অভ্যন্তরেই এক ভীতি, নিরাপত্তাহীনতা ও হতাশার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এইরকম অস্থিরতা চলতে থাকলে আগামীদিনে নির্বাচনী কাজ পরিচালনারত কর্মচারীরা মনোবল হারাতে পারেন যা সঠিক ভূমিকা পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনে কমিশন নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শিক্ষক রাজকুমার রায়ের নৃশংস মৃত্যু ঘটেছিল আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তেমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে, সে বিষয়ে আপনার পক্ষ থেকে সব ধরণের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

সুষ্ঠু ও নির্ভীকভাবে নির্বাচন পরিচালনার স্বার্থে নির্বাচনী কাজে যুক্ত কর্মচারদেনা প্রশাসনিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদানসহ যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করছি। পাশাপাশি, এই বিষয়ে আমরা আপনার সাথে আলোচনায় আগ্রহী।

আশাকরি এই ব্যাপারে গুরুত্ব উপলব্ধি করে আপনি যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

ধন্যবাদসহ

ভবদীয়,
(বিশ্বজিৎ গুপ্তচৌধুরী)
।। সাধারণ সম্পাদক।।

ক্রমিক নং কো-অর্ডি ৩৬/ ২৩ (২০) / ১৮
তারিখ: ১২/০৩/২০২০

অনুলিপি প্রেরণ করা হল :—
মাননীয় জেলা শাসক .... জেলা।

প্রতি হাতে হাতিয়ার

আমাদের প্রিয় সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ার ৫১তম প্রকাশনা বর্ষে প্রবেশ করতে চলেছে মে’ ২০২৩ সংখ্যা থেকে। স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটা একটি সংগঠনের মুখপত্রের লাগাতার ৫০ বছর ধরে প্রকাশিত হওয়ার মতো বিষয় কেবলমাত্র অভিনন্দনযোগ্য নয়, প্রশংসনীয়ও বটে। সংগঠনের কর্মী-সদস্য অনুগামীদের কাছে এই ঘটনা অত্যন্ত গর্বের। স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটা সবসময়ই কঠিন। পদে পদে বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হতে হয়, তাকে প্রতিনিয়ত মোকাবিলা করেই সংগ্রামী হাতিয়ার তার সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রতিপালন করে চলেছে।

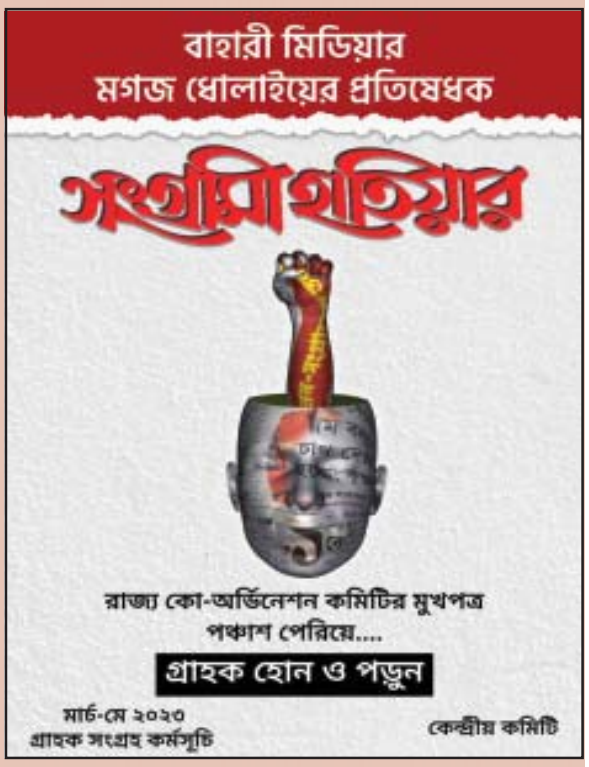

পত্রিকার এই ধরনের ধারাবাহিক প্রকাশনার অন্যতম মৌলিক ভিত্তি হল তার সততা ও স্পষ্টবাদিতা। সংগ্রামী হাতিয়ার তার পাঠকের সাথে কোনো ছলনার আশ্রয় নিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে না। প্রাত্যহিক সংবাদপত্রের বেশিরভাগটাই তো পাঠকের কাছে নিজেকে নিরপেক্ষ হিসেবে জাহির করে, যা সত্য নয়। কর্পোরেট পুঁজির মালিকানাধীন দৈনিক বা পিরিয়ডিকাল পত্রিকা / বুলেটিন / ম্যাগাজিনগুলি তাদের সংবাদ বা নিবন্ধ পরিবেশনার মধ্য দিয়ে কর্পোরেট স্বার্থকেই প্রাধান্য দেয়। কিন্তু সেটা কৌশলে আড়াল করে পাঠকের কাছে। সংগ্রামী হাতিয়ার ঠিক উল্টো কাজটা করে। সে নিরপেক্ষ

● *দ্বিতীয় পৃষ্ঠার প্রথম কলমে*

সম্পাদকীয়

এটা ২০২৩, মনে থাকে যেন

রাজ্যে দশম পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী ৮ জুলাই, ২০২৩, একদিনে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন ৮ জুন পঞ্চায়েত নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা করার পর সমস্যায় পড়েছে মূলত বিরোধী দলগুলি। প্রচার, প্রস্তুতির সুযোগ কার্যত না পাওয়ায়, বাস্তবতা সৃষ্টি হয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির সামনে। তিনটি স্তর মিলিয়ে প্রায় ৭৪ হাজার আসনে প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেবার জন্য ৬ দিন ৪ ঘন্টা করে মাত্র ২৪ ঘন্টা ধার্য হয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সকল রাজনৈতিক দলের সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকার এর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। তবে ২০১৩, ২০১৮ পেরিয়ে এখন ২০২৩। পরিস্থিতির গুণগত অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। দুর্নীতির দায়ে শাসকদল কার্যত কোণঠাসা। জনগণ বামপন্থী দলগুলির স্লোগানে, কর্মসূচীতে বেশি বেশি করে আকৃষ্ট হচ্ছে। এমতাবস্থায় দশম পঞ্চায়েত নির্বাচনের তরী পার হবার জন্য শাসকের যেকোন কৌশল মোকাবিলা করতে জনগণ প্রস্তুত হচ্ছে। বিরোধীদের নমিনেশন জমা দেবার প্রাথমিক চিত্র অন্তত তাই বলছে।

স্বৈরাচারীরা জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করতে চায়। মতামত দেবার অধিকারগুলির উপর আক্রমণ নামিয়ে আনে। রাজ্যের তৃণমূল সরকার নাগরিকদের জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করার অধিকারটুকুও কেড়ে নিতে চায়। রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্বে যে নির্বাচনগুলি হয়, তার কোনটিই সময়মত করার রেকর্ড বিগত ১২ বছরে নেই। এই সরকারের আমলে এইবার নিয়ে তিনটি পঞ্চায়েত নির্বাচন হতে যাচ্ছে। ২০১৩ সালে অষ্টম পঞ্চায়েত নির্বাচনকে বিলম্বিত করতে আদালতের মুখোমুখি হতে হয়েছিল রাজ্য সরকারকে। অবশেষে অভূতপূর্বভাবে ৫ দফায় নির্বাচন হয়। নির্বাচনের পূর্বে সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদের সিংহভাগ দখল করে নেয় শাসক দল। নির্বাচনের আগেই গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪৮,৮০০ আসনের ৫,৩৫৬টি, পঞ্চায়েত সমিতির ৯,২৪০টি আসনের মধ্যে ৮৭৯টি এবং জেলা পরিষদের ৮২৫টি আসনের মধ্য ১৫টি আসন সন্ত্রাস করে দখল করে শাসক দল। নির্বাচনের দিনগুলিতে চলে ব্যাপক ছাপ্পা ভোট, বুথ দখলের ঘটনা, জয়ী বিরোধীদের প্রলোভন দেখিয়ে অথবা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে দলবদলে বাধ্য করার তৃণমূলী সংস্কৃতিও রাজ্যে চালু হয় সেই সময়।

তৃণমূল শাসনে দ্বিতীয় পঞ্চায়েত ভোট অর্থাৎ নবম পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রথমে নির্বাচন কমিশন তিন দফায় ভোটের নির্ঘন্ট প্রকাশ করে। সর্বোচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপে ১৪ মে, ২০১৮ একদিনে নবম পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের পূর্বে ব্যাপক সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে শাসক দল। মোট আসনের ৩৪ শতাংশ (২০ হাজারের বেশী) আসনে বিরোধীরা প্রার্থী দিতে না পারার জন্য শাসক দল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়। এরমধ্য দিয়ে প্রায় ২ কোটি ভোটারকে তাদের মতদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। এই ঘটনা রাজ্যে শুধু নয় গোটা দেশে বেনজির। তিনটি জেলা পরিষদ নির্বাচনের আগেই দখল করে তৃণমূল। গোটা নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রহসনে পরিণত করা হয়। একাধিক জেলা পরিষদ বিরোধীশূন্য হয়ে যায়। ২০১৮-র পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয় ২০,০৭৬ আসনে (৩৩ শতাংশ), ২০১৩ সালে এই সংখ্যা ছিল ৬২৭০। ২০১৮-র নির্বাচনে শাসকদলের সন্ত্রাসের বলি হয় ৫০ জন নিরীহ মানুষ। কাকদ্বীপে বাম রাজনীতির সমর্থক দম্পতি দেবু দাস ও ঊষা দাসকে পুড়িয়ে মারা হয়।

বাম আমলে সাতটি ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছিল এবং সবই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। সেই নির্বাচনে বিরোধীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে, জয়লাভ করেছে শুধু নয় একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এমনকি জেলা পরিষদ দখল করেছে। ৩৪ বছরে এই নজির আছে। সেই সময় পঞ্চায়েত ভোট গ্রামের মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে একটা উৎসবের চেহারা নিত। গণতন্ত্র উপভোগের উৎসব। বিগত ১২ বছরে সবকটি নির্বাচনই, গণতন্ত্র লুট আর সন্ত্রাসের উৎসবে পরিণত হয়েছে।

এই রকম অবস্থায় আগামী ৮ জুলাই রাজ্যে দশম পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আমরা প্রশাসনের কর্মচারী হিসাবে নির্বাচনী কর্মী হিসাবে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে নিজেদের নিয়োজিত করব। একইভাবে পঞ্চায়েত এলাকায় যাদের বসবাস তারা সজাগ-সতর্ক হয়ে সচেতনতার সাথে সপরিবারে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করব। এই নির্বাচনের ফলাফলের দ্বারা রাজ্য সরকারের কোন পরিবর্তন হবে না। কিন্তু নির্বাচনী ফলাফলের মাধ্যমে শাসক দল এবং রাজ্য সরকারকে রাজনৈতিক বার্তা অবশ্যই দেওয়া যেতে পারে। বর্তমানে সন্ত্রাস, লুট, দুর্নীতির যে বাড়বাড়ন্ত তার বিরুদ্ধে সচেতন প্রতিবাদ, স্বৈরাচার শেষ কথা বলবে না—এই বার্তা নিশ্চিতভাবেই রাজ্যের নির্বাচকমণ্ডলী দেবে। পাশাপাশি বহুমাত্রিক বিভাজনের শক্তিকেও হুঁশিয়ারী দেবার দায়িত্ব প্রতিপালন করবে নির্বাচকমণ্ডলী। বহুত্ববাদের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে যেসব শক্তি তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে পশ্চিমবঙ্গ তাদের স্বর্গরাজ্য হতে পারে না।

এটা ২০১৩ বা ২০১৮ সাল নয় এটা ২০২৩ সাল। ২০১১ সালে 'পরিবর্তনের' পর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। কেন্দ্রে ৫৬ ইঞ্চির 'বিকাশ পুরুষ'-এর মুখোশ এখন ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে। তেমনি রাজ্যের 'সততার প্রতীক'-এর মেক-আপ খসে পড়েছে। প্রগতিশীল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। সর্বোপরি তাদের নেতৃত্বে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। ২০১৩ বা ২০১৮-র মত সন্ত্রাস করতে গেলে মানুষ লাঠি ঝাঁটা নিয়ে ওদের তাড়া করছে। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচন যে সম্পূর্ণ আলাদা প্রেক্ষাপটে হতে চলেছে তা বলে দিচ্ছে বিরোধী প্রার্থীদের জন্য গত দুবারের তুলনায় অনেক বেশী সংখ্যায় মনোনয়ন দেবার চিত্র। আমরা রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা নির্বাচনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করি বা না করি এই নির্বাচন আমাদের ক্ষেত্রেও একটা ভূমিকা পালন করবে। নির্বাচনের ইতিবাচক ফলাফল স্বৈরাচারী সরকারের ঔদ্ধত্য অনেকটা দমিত করবে নিশ্চিতভাবেই। তার ইতিবাচক প্রভাব আমাদের দাবিদাওয়া অর্জনের জন্য সংগ্রাম আন্দোলনের উপর পড়বে। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার এই পঞ্চায়েত নির্বাচন আমাদের ছিনিয়ে নেওয়া অর্জিত অধিকারগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনকে আরও বেগবান করবে এটা আশা করা যায়। তাই দশম পঞ্চায়েত নির্বাচনকে পাখির চোখ করতে হবে আমাদেরও।

১৭ জুন, ২০২৩

প্রতি হাতে হাতিয়ার

● *প্রথম পৃষ্ঠার পরে*

নয়, বরং সে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের শুধু নয় খেটে খাওয়া মানুষের পক্ষে—এই বিষয়টা কখনো লুকাতে চায় না। বিগত ৫০ বছরের প্রতিটি প্রকাশনার ছত্রে ছত্রে এই পক্ষপাতিত্বের অনুররণনই নির্ভীকভাবে প্রতিধ্বনিত করেছে সংগ্রামী হাতিয়ার। সংগ্রামী হাতিয়ার সমাজের প্রগতির পক্ষে। সেই অনুযায়ী অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় নিবন্ধ প্রকাশ করে। কারণ আমাদের মাথা কারও কাছে বিক্রিত নয়। আমাদের দায়বদ্ধতা কর্মচারী সমাজের প্রতি। কর্মচারী সমাজের সামনে উদ্ভূত নানা প্রতিকূলতা বৃহত্তর সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সেই বৃহত্তর সমাজের ব্যপ্তি রাজ্য বা দেশ শুধু নয়, দুনিয়াজুড়ে তাই সংগ্রামী হাতিয়ার কর্মচারীদের আশু সমস্যার সুদূর নিহিত বীজ সম্পর্কেও অবহিত করাকেই কর্তব্য বলে মনে করে। এই ক্ষেত্রে কোনো মুখোশ পড়বার প্রয়োজন তার হয় না।

কর্মচারীরা কূপমণ্ডুক হয়ে থাকুক, অর্থনীতিবাদে আচ্ছন্ন থাকুক তা সংগ্রামী হাতিয়ার চায় না। চায় না কারণ কর্মচারীদের আর্থিক ও অধিকারগত দাবিদাওয়া আদায়ের সাথে সমাজের অন্যান্য অংশের সমস্যার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সম্পর্ক আছে। এই কথা কি বলা যায় এই রাজ্যের শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর তথা সাধারণ মানুষ সবাই সুখে আছে। তাদের কোনো সমস্যা নেই? তা তো নয়। আমাদের সাথে অন্যান্য অংশের সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক। আমাদের মহার্ঘভাতার অধিকার সুরক্ষিত হতে পারে তখনই যখন শ্রমজীবী অন্যান্য অংশের অধিকার সুরক্ষিত থাকবে। আর এটার জন্য রাজ্য সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই কর্মচারীদের কোনো মোহাবিষ্ট অবস্থায় রাখা নয়, তাদের পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার দায়িত্ব প্রতিপালন যে কোনো মুখপত্রের অন্যতম কাজ। সংগ্রামী হাতিয়ার এই কাজটা দায়িত্ব নিয়ে প্রতিপালন করে। তার জন্য শাসকের চোখ রাঙানীও সহ্য করতে হয়। তবে আমাদের প্রিয় মুখপত্র অবশ্য তার কোনো পরোয়া করে না। সে তার আদর্শের প্রতিও দায়বদ্ধ।

নিন্দুকেরা বলার চেষ্টা করে আদর্শ, মতাদর্শ এসব নাকি রাজনীতির কথা। সত্যি কি তাই? মানব সমাজের প্রগতির পক্ষে কথা বলা যদি রাজনীতি হয়, তাহলে সংগ্রামী হাতিয়ার এই রাজনীতি করে এবং করবে। আমরা রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো জীব নই। এই সমাজের ভালো-মন্দের সাথে আমরাও জড়িয়ে আছি। তর্কের খাতিরে যদি ধরেনি আমাদের অর্জিত সব অধিকার আদায় করা হয়ে গেছে, কিন্তু শ্রমজীবী অপর অংশের মানুষ নিদারুণ নিষ্পেষণের মধ্যে রয়েছে। তাহলে আমরা কি প্রকৃতই ভালো থাকতে পারব। এভাবে কি একা একা ভালো থাকা যায়? কখনোই না। তাই তো সংগ্রামী হাতিয়ার কর্মচারী স্বার্থের কথা বলার সাথে সাথে বৃহত্তর সমাজের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার সীমিত প্রয়াস নেয়। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় শোষণ থেকে কারও নিস্তার নেই। তাই প্রয়োজন উন্নততর এমন এক সমাজ, যে সমাজ হবে শোষণহীন। এটা কোনো অলীক কল্পনা নয়। ১৯১৭ সালে রাশিয়াতে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এমন সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। তাই এই ধরনের উন্নততর শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ার বস্তুনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা সংগ্রামী হাতিয়ারের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হিসাবে থাকে। এই ধরনের আলোচনাকে কেউ যদি রাজনীতি করা বলে, তাহলে এই 'রাজনীতি' সংগ্রামী হাতিয়ার একশোবার করবে।

আমাদের মধ্যে এই মুহূর্তে নানা ধরনের বিপজ্জনক শক্তি সক্রিয়। সেই ভয়ঙ্কর শক্তির লক্ষ্য—মানুষে মানুষে বিভাজন সৃষ্টি করা। যাতে মানুষ শাসকের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে। কর্মচারী ঐক্যের বিভাজনের ক্ষেত্রেও এই শক্তি সক্রিয়। এই শক্তি এবং এই শক্তির পিছনের রাজনীতির কথাও কর্মচারী স্বার্থেই সংগ্রামী হাতিয়ারে উল্লিখিত হয়। বিভাজনের শক্তির বিরুদ্ধে কর্মচারীদের সচেতন করাটাকেও কোনো কোনো মহল রাজনীতি বলে নাক সিঁটকায় অবশ্য।

সংগ্রামী হাতিয়ার সর্বাগ্রে কর্মচারী সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ। কর্মচারীদের ওপর যেখানে যখন আক্রমণ নেমে এসেছে, গর্জে উঠেছে সংগ্রামী হাতিয়ার। ২০১১ সাল থেকে পরিবর্তনের যে কুফল সমগ্র রাজ্যবাসী এবং অবশ্যই কর্মচারী সমাজ ভোগ করছে তার বিরুদ্ধে আপোষহীন থেকেছে সংগ্রমী হাতিয়ার। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং তার অন্তর্ভুক্ত সমিতিসমূহের লড়াইয়ের প্রতিচ্ছবি সংগ্রামী হাতিয়ার। লেনিনের ভাষায় মুখপত্র শুধু যৌথ প্রচারক নয়, যৌথ সংগঠকও বটে—একে শুধু ধারণ নয়, প্রায়োগিক রূপ দিয়েছে সংগ্রামী হাতিয়ার। ট্রেড ইউনিয়ন মুখপত্র সংগ্রামের হাতিয়ার অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো হয়। কিন্তু আমাদের হাতিয়ার অর্থাৎ মুখপত্র সংগঠনের সাথে যৌথ সংগ্রামী। ৫১তম গ্রাহক বর্ষে সমস্ত কর্মচারী বন্ধুর কাছে গ্রাহকভুক্তির আবেদন নিয়ে হাজির হতে হবে আমাদের। একইসঙ্গে প্রতিটি গ্রাহককে সময়মতো মুখপত্র পৌঁছে দেবার অঙ্গীকারও আমরা গ্রহণ করছি।

—মানস কুমার বড়ুয়া

খাদ্য সচিবকে গণ ডেপুটেশন

গত ১৭ মার্চ, ২০২৩ পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির পক্ষ থেকে বিভাগের ক্যাডারগত ও জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবি নিয়ে খাদ্য সচিবের কাছে গণডেপুটেশন দেওয়া হয়। মূলত যে ১৬ দফা দাবি নিয়ে এই গণডেপুটেশন কর্মসূচী হয় তা হল বকেয়া মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান, বিভাগের সমস্ত শূন্যপদে স্বচ্ছভাবে স্থায়ী নিয়োগ, নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর্যায় তালিকা ও পদোন্নতির আদেশনামা প্রকাশ, অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ, সুষ্ঠু বদলীনীতি, প্রকৃত কৃষকের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ এবং সমস্ত রাজ্যবাসীর হাতে ডিজিটাল রেশন কার্ড প্রদান। ঐদিন খাদ্য ভবনে দুই শতাধিক কর্মচারীর জমায়েতে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি উৎসর্গ মিত্র। সমিতির সাধারণ সম্পাদক অশোক প্রামাণিক প্রশাসনের কাছে দেওয়া ডেপুটেশনে আলোচনার বিষয়গুলি কর্মচারীদের কাছে তুলে ধরেন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী আরও ঐক্যবদ্ধ ও তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায় ও সহ সম্পাদক প্রণব কর এই কর্মচারী জমায়েতে উপস্থিত ছিলেন। ❑

জয়ী হবে জনগণ

● *প্রথম পৃষ্ঠার পরে*

সমিতির ক্ষেতমজুর পরিবারের প্রতিনিধির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হত। এতদিন যাঁরা মনুষ্যপদবাচ্য বলেই বিবেচিত হতেন না, তাঁরাই হলেন গ্রাম বাংলার বহুমাত্রিক উন্নয়নের কাণ্ডারী।

একটা কথা অনস্বীকার্য যে, পশ্চিমবাংলায় জমির আন্দোলন এবং প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের আমলে দেশের ভূমি সংস্কার আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করে, কৃষকের হাতে জমি তুলে দেওয়া, বর্গা রেকর্ড ইত্যাদির মাধ্যমে আর্থিক ক্ষমতায়ন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতায়নের ভিতটাকে তৈরি করে দিয়েছিল। অপরদিকে এযাবৎকাল, কেন্দ্রীয় ভূমিসংস্কার আইনের ফাঁক-ফোঁকর ব্যবহার করে একই পরিবারের বিভিন্ন সদস্য এমনকি বাড়ির পোষা বেড়াল, টিয়াপাখির নামে বিঘার পর বিঘা জমি ভোগ করা গ্রামীন ধনীদের মৌরসী পাট্টা দুর্বল হয়েছিল।

ভূমি সংস্কার কর্মসূচী, পঞ্চায়েতের হাতে আঞ্চলিক চাহিদার নিরিখে উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষমতা এবং তার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করার মধ্য দিয়ে গ্রামবাংলায় প্রকৃত প্রস্তাবেই 'নবজোয়ার' সৃষ্টি হয়েছিল। যে নবজোয়ার ছিল বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বাস যে গ্রাম, সেখানে জীবন মানের লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন ঘটানোর উৎস। আজকের বহুল বিজ্ঞাপিত পা-চাটা খিদ্‌মদগার, পুলিশবাহিনী আর মিডিয়াকূলের ভীড় করে থাকা তথাকথিত নবজোয়ার কর্মসূচীর সাথে যার ফারাক আসমান-জমিন। এই সবই ছিল কমরেড জ্যোতি বসুর স্বপ্ন। যা ধাপে ধাপে তাঁর দীর্ঘ মুখ্যমন্ত্রীত্বকালে বিকশিত হয়েছিল, আলোকিত করেছিল গোটা দেশকে। রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বের কালে সংবিধান সংশোধন করে ভারতীয় সংসদ যে পঞ্চায়েত আইনে প্রণয়ন করেছিল, তারও প্রেরণা ছিল পশ্চিমবাংলার পঞ্চায়েত।

তাই পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রকৃত তাৎপর্য শুধুমাত্র কোন একটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীকে জয়ী করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পশ্চিমবাংলার পঞ্চায়েতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে পুনরায় সজীব করার লড়াই হল এই নির্বাচন। প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন? কারনটা হল এই রাজ্যে পঞ্চায়েতের যে মডেল গড়ে তোলা হয়েছিল, তা ছিল একটা সুনির্দিষ্ট শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গির ফসল। মেহনতী মানুষের স্বার্থ সমন্বিত রাজনৈতিক - প্রশাসনিক - সামাজিক প্রয়াসের ম্যানিফেস্টেশন। কারও মহানুভবতার ফল নয়। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত আইনকে অনুসরণ করে সারা দেশের জন্য পঞ্চায়েত আইন প্রণয়ন করা হলেও, খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থবাহী শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন সরকারের রাজ্যে রাজ্যে অনুপস্থিতি, পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আমলাতান্ত্রিক খাঁচায় বন্দী করে রেখেছে। এ থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়—জনস্বার্থে আইন প্রণয়ন জরুরী। কিন্তু তার থেকেও বেশী জরুরী সেই আইন রূপায়নে সত্যনিষ্ঠ হওয়া। বামফ্রন্ট আমলে গড়ে ওঠা পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অনন্য সাফল্যের কারণ আইন প্রণয়ন ও রূপায়ণে একইরকম দায়বদ্ধতা।

২০১১ সালে রাজ্যে রাজনৈতিক ভারসাম্যের পরিবর্তনের পরে, স্বভাবতই যে প্রশ্নটা সর্বাধিক গুরুত্ব পাওয়ার কথা ছিল, তা হল পশ্চিমবাংলার পঞ্চায়েতের জনবাদী চেহারা ও কাঠামোটাকে ধরে রাখা যাবে তো? নাকি প্রাক '৭৭ অন্ধকারের দিকেই তার পশ্চাদপসরণ ঘটবে? এমন আশংকা যাঁদের মধ্যে ছিল, তাঁরা সদ্য পরিবর্তীত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কোণঠাসা অবস্থায় ছিলেন। ফলে জনপরিসরে এই আশংকার কথা জোর গলায় বলার সুযোগ তাঁরা পাননি। তাছাড়াও পরিবর্তনের সাথে সাথে যুক্তিহীন উৎশৃংখলতা এবং বাহুবলীদের দাপাদাপি, বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে নিকেষ করার অভিযান যেভাবে শুরু হয়েছিল, সেই সময় সুস্থ বিতর্কের কোন পরিসরই ছিল না। কিন্তু জ্যোতি বসুর স্বপ্ন যে অচিরেই ধূলিসাৎ হবে, তা নিয়ে যাঁরা একান্তেও ভাবতেন, তাঁদের কারও মধ্যেই কোন সংশয় ছিল না। সংশয় ছিল না কারণ, পশ্চিমবাংলার পঞ্চায়েতের প্রকৃত চরিত্রকে রক্ষা করে তাকে পরিচালনা করার জন্য যে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন, তা রাজ্যের বর্তমান শাসক দলের তো নেই-ই, এমনকি সাধারণভাবে কোন (দক্ষিণপন্থী) নীতি, আদর্শ বা নির্দিষ্ট কোন ঘোষিত কর্মসূচীও তাদের নেই। মিথ্যা প্রচার, বলপ্রয়োগ অথবা চক্রান্তের মাধ্যমে বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি বিশেষত বামপন্থীদের দুর্বল করার চেষ্টা এবং দুর্নীতি এই দলটার ভিত্তি। এদের কর্মপদ্ধতি হল প্রলোভন সৃষ্টি, বিভ্রান্ত করা, ভয় দেখানো, বল প্রয়োগ এবং দলীয় স্বার্থে পুলিশ প্রশাসন ও সাধারণ প্রশাসনের যথেচ্ছ ব্যবহার। লক্ষ্য একটাই—লুটেপুটে খাওয়ার সময়টাকে প্রলম্বিত করার জন্য যেন তেন প্রকারে ক্ষমতায় টিকে থাকা। শুধু টিকে থাকাই নয়, বাধাহীন লুটপাটের স্বার্থে যেকোন স্তরের ক্ষমতায় নিরঙ্কুশ প্রাধান্য স্থাপন। তাই লোকসভা থেকে শুরু করে সমবায় সমিতি বা স্কুল পরিচালনা কমিটির নির্বাচনেও সামান্য গণতান্ত্রিক পরিসরও এরা ছাড়তে চায় না। কারণ গণতান্ত্রিক পরিসর মানেই নির্বাচনী ফলাফলকে ইচ্ছে মতন প্রভাবিত করার সুযোগ হ্রাস পাওয়া। যার অর্থ দেদার লুটের লাইসেন্সকে সর্বত্র কার্যকরী করতে না পারা।

এহেন একটি রাজনৈতিক শক্তি পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে দখল করতে পারলে যা হওয়ার কথা তাই হয়েছে। ঠিক যে যে উপাদান দিয়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কাঠামোটা তৈরি হয়েছিল, সেই উপাদানগুলোকেই দ্রুততার সাথে ভাঙ্গা হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে ভূমিসংস্কার কর্মসূচীর মাধ্যমে গড়ে ওঠা আর্থিক স্বনির্ভরতা ছিল পঞ্চায়েতের ভিত্তি। যাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতায়নের ধাঁচাটা নির্মিত হয়েছিল। এখন চলছে, ভূমি সংস্কারের অ্যান্টিথিসিস। কৃষকের কাছ থেকে ছলে-বলে জমি কেড়ে নিয়ে, পাট্টা প্রাপকদের পাট্টা কেড়ে নিয়ে বেসরকারী প্রমোটর চক্রের হাতে সেই জমি তুলে দেওয়া হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে দুটি নির্দিষ্ট বিষয় উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে পরিবার পিছু যে চাষযোগ্য জমি নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, সময়ের সাথে সাথে সেই পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায়, পারিবারিক কৃষি জমি আর ভরণপোষণের জন্য পর্যাপ্ত আয়ের উৎস থাকছে না। বামফ্রন্ট সরকার এই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছিল দু'ভাবে—(১) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতগুলিকে একত্রিত করে সমবায় চাষে উৎসাহ প্রদান এবং (২) কৃষির ওপর চাপ কমানোর জন্য শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির উদ্যোগ। অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা। এই প্রচেষ্টা ফলপ্রসু হলে গ্রামীন অর্থনীতি তার নাব্যতা রক্ষা করতে পারত। শহরের অর্থনীতিতেও শিল্প বিকাশের হাত ধরে জোয়ার আসত। এক কথায় বলা যায়, উন্নয়নের একটা স্তর পর্যন্ত এগিয়ে কৃষির সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় রেখে বিকল্প পথ বা শিল্পায়নে দিকে এগোনোর মধ্যেই ছিল পশ্চিমবাংলার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চাবিকাঠি। অথচ গণ্ডগোলটা শুরু করা হল এখান থেকেই। 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ' আর্থিক বিকাশের এই সঠিক স্লোগানটিকে অপপ্রচারের ঢক্কা নিনাদে দুমড়ে মুচড়ে কৃষি বনাম শিল্পের এক মেকি সামাজিক দ্বন্দ্বকে খাড়া করা হল। যাঁরা সফল ভূমি সংস্কার কর্মসূচী রূপায়ণের মাধ্যমে কৃষকের আর্থিক ক্ষমতায়নের পথ সুগম করেছিলেন, তাঁদেরকেই কৃষক বিরোধী খলনায়ক সাজানো হল। কৃষি থেকে আয় সীমাবদ্ধতায় পৌঁছানো সত্বেও, জমির প্রতি কৃষক পরিবারের যে নাড়ির টান, তাকেই ব্যবহার করা হল এক নেতিবাচক আবেগ উস্‌কে দেওয়ার জন্য। ফলত নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর প্রভৃতি একের পর এক ধ্বংসাত্মক রাজনৈতিক প্রকল্পের সাক্ষী থাকল পশ্চিমবাংলা। পরবর্তী ঘটনাক্রম সকলেরই জানা। ফলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রোয়জন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত শতাব্দীর নব্বই দশকের শেষ পর্ব থেকে সারা দেশেই নয়া উদারবাদ কৃষি ক্ষেত্রে থাবা বসাতে শুরু করেছিল। তার প্রভাব পড়েছিল পশ্চিমবাংলার কৃষকদের ওপরেও। এতদ্‌সত্বেও কৃষকদের ফসলের লাভজনক দাম সুনিশ্চিত করতে সরকারী উদ্যোগ ও পরিকল্পনা জারি ছিল। কিন্তু রাজ্যে রাজনৈতিক ভারসাম্যর পরিবর্তনের পরে কৃষকদের ফসলের ন্যূনতম সহায়কমূল্য প্রদানে সরকারী উদ্যোগ উঠে গেল। শুরু হল, অভাবের তাড়নায় কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা। যা, ১৯৭৭-২০১১ এই ৩৪ বছরে কখনও ঘটেনি। কৃষকের এই সংকটকে ব্যবহার করে কখনও প্রলোভন, কখনও ভয় দেখিয়ে শুরু হল জমি কেড়ে নেওয়া। শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষি জমি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে ক্রয় করার পরিকল্পনাকে যারা কৃষকদরদী সেজে ভেস্তে দিয়েছিল, এখন তারাই বেসরকারী জমি হাঙ্গরদের জন্য বিভিন্নভাবে জমি কেড়ে নেওয়া শুরু করল। না, শিল্পায়নের জন্য নয়। বেসরকারী হোটেল, রিসর্ট ইত্যাদি গড়ে তোলার জন্য।

কৃষির সর্বব্যাপী সংকটে ভূমি সংস্কারের সুফল শুকিয়ে যেতে বসেছে। দুর্বল হয়েছে কৃষিজীবীদের আর্থিক সক্ষমতা। এই সংকটের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গ্রামবাংলায় শাখা-প্রশাখার বিস্তার ঘনিয়েছে মহাজনী ঋণ এবং বিভিন্ন চিটফান্ড সংস্থা। কৃষি সংকটের কারণে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছেন ঋণের ফাঁদে।

পঞ্চায়েত কাঠামোর শক্তপোক্ত ভিত্তি ছিল ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে আর্থিক ক্ষমতায়ন। যা রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের পথকে সুগম করেছিল। আর্থিক সক্ষমতা দুর্বল হতে শুরু করার ফলে রাজনৈতিক, সামাজিক ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়ারও বিপরীতমুখী যাত্রা শুরু হল। মহাজনী কারবারী, চিটফান্ড মালিক, জমির প্রমোটর ও দালাল প্রভৃতি গ্রামের নব্য ধনীরা তাদের আইনী-বেআইনী ব্যবসার রমরমা বজায় রাখার জন্য শাসকদলের ছত্রছায়ায় জড়ো হতে শুরু করল। আগেই বলা হয়েছে, রাজ্যের বর্তমান শাসক দলের কোন আদর্শ, নীতি বা রাজনৈতিক সংস্কৃতির বালাই নেই। রাজনৈতিক - প্রশাসনিক ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে আখের গোছানোই এদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। স্বভাবতই গ্রামীন ভুঁইফোড় নব্য ধনীরা এখন একটি দলের সম্পদ হিসেবেই বিবেচিত হয়। ফলে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের বিভিন্ন পথে এদেরকে বসিয়ে স্বার্থচরিতার্থ করার মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হল। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের (যেমন এম এন রেগা প্রকল্প) জন্য বরাদ্দকৃত প্রচুর পরিমান অর্থ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিভিন্ন সম্পদ সৃষ্টির কাজে এবং নগদ ও মজুরি হিসেবে উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছানোর কথা। এখানেই বাসা বাঁধল দুর্নীতি। গ্রামীন নব্য ধনীরা রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নিজেদের ও দলের আখের গোছাতে শুরু করল। বঞ্চিত হলেন প্রকৃত উপভোক্তারা। যত ধরণের দুর্নীতির কথা শোনা যাচ্ছে, তা সবই হল উক্ত মাস্টার প্ল্যানের অংশ। এই দুর্নীতির চক্র ধারাবাহিকভাবে চালাতে গেলে একই সাথে দুটি অস্ত্রের প্রয়োগ ঘটাতে হয়। একদিকে বল প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষকে দমিয়ে রাখা, অপরদিকে বিভ্রান্ত করে দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা।

অর্থনীতিতে বে-আইনী লেনদেন যখন মুখ্য ভূমিকা নেয়, তার উচ্ছিষ্ট ভোগ করার লুম্পেন বাহিনী তৈরি হয়ে যায়। উচ্ছিষ্টই হয় সেই লুম্পেন বাহিনীর জীবিকা। ফলে বেআইনী লেনদেন চালিয়ে যাওয়ার একটা তাগিদে তাদেরও থাকে। শাসক দল তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার জন্য লুম্পেন বাহিনীকে ব্যবহার করে। লুম্পেন বাহিনীও জানে, বেআইনী লেনদেনের উচ্ছিষ্ট ভোগ করতে হলে শাসকদলের হয়ে বোমা-বন্দুক-গুলি নিয়ে নেমে পড়তেই হবে। দুঃখের হলেও সত্যি, রাজ্যে কর্মসংস্থানের চাহিদা অনুযায়ী সুযোগ সৃষ্টি হলে, যারা সুস্থ জীবনটাই বেছে নিতেন, তাঁদেরও কেউ কেউ উপায়ন্তর না দেখে লুম্পেন বাহিনীতে নাম লেখাচ্ছেন।

এতো গেল বল প্রয়োগের দিক। বিভ্রান্ত করার কাজটা করেন মূলত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি মাঝে মাঝে প্রশাসনিক বৈঠক ডেকে বি ডি ও/এস ডি ও-দের কাজের সমালোচনা করেন। যাতে মানুষ মনে করে আমার প্রাপ্য না পাওয়ার দায় আধিকারিকের। এইভাবেই তিনি নিজ দলের লুটেরাদের আড়াল করেন।

স্বভাবতই পঞ্চায়েত নির্বাচন শুধুমাত্র একটা নির্বাচন নয়। সুটেরাদের হাত থেকে মুক্ত করে পুনরায় মানুষের পঞ্চায়েত গড়ে তোলার লড়াই। রাজ্য ও রাজ্যবাসীর স্বার্থে যা জরুরী। লুটেরারা ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার জন্য হিংসাশ্রয়ী পথ অবলম্বন করতে শুরু করেছে। মনোনয়ন পেশের দিনগুলিতেই দেখা গেছে তারা কতটা মরিয়া। ফলে যাঁরা মানুষের পঞ্চায়েতকে পুনরুদ্ধার করতে চান, তাঁরা আক্রান্ত ও রক্তাক্ত হচ্ছেন। এর বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধও গড়ে উঠছে। অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের এই লড়াইয়ে বহু মূল্য চুকিয়েও অবশেষে জয় হবে অত্যাচারিতের। এই প্রত্যয় আমাদের রয়েছে। ❑

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন ঃ অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য লড়াই

বিদ্যুত দাস

পশ্চিমবঙ্গে দশম পঞ্চায়েত নির্বাচন আগামী ৮ জুলাই, ২০২৩। নির্বাচন ঘোষিত হয় ৮ জুন। সংবিধানের ২৪৩নং ধারা অনুযায়ী বাধ্য হয়েই দেরিতে হলেও সরকারকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ঘোষণা করতে হয়েছে। সূচী অনুযায়ী মে মাসে ভোট হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা পিছিয়ে দেওয়া হয়। ২০১৮-র ১৪ই মে রাজ্যে একদফাতেই পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছিল। এবার ২২টি জেলায় পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এক দফাতেই। রাজ্য নির্বাচন কমিশনার নির্বাচিত হওয়ার পরেই আচমকা নির্বাচনের দিন ঘোষণা করে দেওয়া হয় কোনরকম সর্বদল বৈঠক ছাড়াই। নির্বাচনের দিন ঘোষণার পরের দিন থেকেই মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। রাজ্যের বিরোধী দলগুলি অল্প সময়ের মধ্যে নিজেদের গুছিয়ে নিতে পারবে না, বেকায়দায় পড়বে, সেই লক্ষ্যেই যথেষ্ট সময় না রেখেই নির্বাচন প্রক্রিয়ার কাজ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে বিরোধী দলগুলি অভিযোগ করেছে এবং দুটি বিরোধী দল আদালতে মামলাও করেছে। মামলার প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে উচ্চ আদালত জানিয়েছে, ''কমিশন তাড়াহুড়ো করছে, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হয়নি, এই সময়সীমা বাড়ানো উচিত। উল্লেখ্য রাজ্যের ৫ কোটি ৬৭ লক্ষ ২১ হাজার ২৩৪ জন গ্রামীন ভোটারের জন্য ৯২৮টি জেলা পরিষদ আসনে, ৯,৭৩০টি পঞ্চায়েত সমিতি আসনে এবং ৬৩, ২৮৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র ২৪ ঘন্টা (৬ দিন, দৈনিক ৪ ঘন্টা করে)।

মনোনয়নপত্র জমা করার প্রথম দিন থেকেই যথারীতি শাসকদলের সন্ত্রাস শুরু হয়েছে। মনোনয়নপত্র রাতারাতি ছাপতে হয়েছে, নির্বাচনী প্রশাসনের অপ্রস্তুতি প্রকাশ্যে এসেছে। একইসঙ্গে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষও প্রতিরোধে এগিয়ে আসছে।

পঞ্চায়েত হল তৃতীয় সরকার, গ্রামের সরকার। ২৪শে নভেম্বর, ১৯৫৮ বলবন্ত রাও কমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে আইন প্রণিত হলেও জনগণকে নিয়ে কোথাও সেই পঞ্চায়েত তৈরি হয়নি। ১৯৬৪ সালে পঞ্চায়েতী রাজ গঠিত হলেও কার্যত তার কোন কাজ ছিল না। ১৯৭৩ সালে কংগ্রেস সরকার পঞ্চায়েত আইন তৈরি করে কিন্তু সেই আইনকে কার্যকরী করেনি। ১৯৭৭ সালে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। ১৯৭৭ সালের আগেও এই রাজ্যে যেটুকু পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ছিল তা জনগণের পঞ্চায়েত ছিল না, ছিল জমিদার, জোতদার এবং ধনীদের পঞ্চায়েত, অর্থাৎ পঞ্চায়েত ছিল শ্রেণি শোষণের হাতিয়ার। ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালের দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তনের উদ্যোগ নিলেও সরকার দুটি ক্ষণস্থায়ী হওয়ায় সিদ্ধান্তগুলিকে কার্যকর করা যায়নি। ১৯৭৭ সালে নির্বাচিত বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় জ্যোতি বসু ঘোষণা করেছিলেন, ''রাইটার্স থেকে সরকার পরিচালনা নয়। সরকারকে পৌঁছাতে হবে গ্রামীন মানুষের দোরগোড়ায়, গ্রামের মানুষ ঠিক করবেন গ্রামের উন্নয়ন।'' স্বাধীন ভারতকে সফল পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার সাক্ষী হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে প্রায় ৩১ বছর। ১৯৭৮, ৪ঠা জুন পশ্চিমবঙ্গে প্রথম ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে রাজনৈতিক দল প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। কংগ্রেস ও জনতা দল নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য কোর্টের আশ্রয় নেয়। কিন্তু সফল হয়নি। নির্বাচনে বামফ্রন্টের তুলনায় বিরোধীদের প্রার্থী বেশি ছিল। ফলাফলে বিরোধীরা ৩১.২৫% আসনে জিতেছিল। প্রার্থীদের দাঁড়াতে না দেওয়া, বুথ দখল-এর মত বিষয় ছিল না। ছিল না বিরোধীদের ভোট না দিতে দেওয়ার ঘটনা। শ্রেণি ভারসাম্য পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় গণতন্ত্র।

১৯৭৮-এ পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর বোঝা গেছে ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইন যথেষ্ট নয়। তাই ১৯৮৪, ১৯৮৮, ১৯৯৪ এবং ২০০৩ সালে প্রধান প্রধান সংশোধনী গৃহীত হয়। ১৯৯৩ থেকে পঞ্চায়েতে তপসিলী জাতি, আদিবাসী ও মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ শুরু হয় (ন্যূনতম ৫০%)। ১৯৯৮ সালে সভাপতি, সহ-সভাপতির পদও সংরক্ষণের অধীনে আনা হয়।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী সংবিধান সংশোধন করে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতী মডেল সমস্ত রাজ্যের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করেছিলেন।

বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য ভূমিসংস্কার করে। ফলে গ্রামের আর্থিক বিকাশ ঘটে। মানুষ অধিকার সচেতন হয়। খাস জমি চিহ্নিত করে ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করার অধিকার দেওয়া হয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির উপর।

বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে প্রায় ১৪ লক্ষ ৪ হাজার ৯১ একরের উপর জমি খাস হয়েছে। ২৯ লক্ষ ৮৫ হাজারের বেশি মানুষকে পাট্টা দেওয়া হয়। সারা দেশের মধ্যে ৫৪% পাট্টাদার এই রাজ্যেই আছেন। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের হাতে ৮৪% জমি ন্যস্ত করা হয়। তফসিলি জাতি ও আদিবাসীরা মিলে মোট জনসংখ্যার ৩০% জমির মালিক হন। বিলি হওয়া পাট্টার মধ্যে ৫৫% তপশিলি জাতি ও আদিবাসী, ২৭% সংখ্যালঘু, সংরক্ষণের বাইরের ভূমিহীনরা পাট্টা পেয়েছেন। যৌথপাট্টা ও মহিলাদের নামেও পাট্টা দেওয়া হয়েছে বন্টিত জমির প্রায় ৩০%। বর্গারেকর্ডের মাধ্যমেও অনেক গরিব মানুষ চাষ করার সুযোগ পান। প্রায় ১৫ লক্ষ ১৩ হাজার বর্গাদারের নাম নথিভুক্ত হয়, জমির পরিমান প্রায় ১১ লক্ষ ১৫ হাজার একর।

ভূমিসংস্কারের প্রভাবে দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারীদের সংখ্যা কমে দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে আসে পশ্চিমবঙ্গ। দেশে সবচেয়ে দারিদ্র কমেছে কেরালায়, এই তথ্য জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় প্রকাশিত হয়েছে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে ৬.৯%। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা, উৎপাদন ও চাহিদা বাড়িয়েছে।

গ্রামীন স্তরে বিকেন্দ্রীকরণের ফলে গণতন্ত্র বিকশিত হয়। বিশিষ্ট অধ্যাপক প্রভাত দত্ত 'পঞ্চায়েতী রাজ' পত্রিকায় লেখেন ''এ রাজ্যে ঘটেছে অবদমিত মানুষের বিকাশ। সম্ভবত এ এক ধরনের 'শূদ্র জাগরণ'। বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে ত্রিস্তরেই বিরোধীরা পঞ্চায়েত চালিয়েছে। মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ বিরোধীরা চালিয়েছে। সেগুলি ভাঙ্গার চেষ্টা বা নির্বাচিত সদস্যদের ভাঙ্গিয়ে আনার চেষ্টা করেনি বামফ্রন্ট। ১৯৯২ সালে পঞ্চায়েতের চতুর্থ স্তর গ্রাম সংসদ তৈরি করা হয়। ১৯৯৪ সালে ৭৩তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে পঞ্চায়েতে গ্রাম সংসদ যুক্ত হয়। সর্বস্তরে স্থায়ী সমিতিতে বিরোধী দলের একজন করে যুক্ত করা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারকে পুঁজিবাদী-জমিদারী ব্যবস্থার মধ্যেই কাজ করতে হয়েছে। সরকারের প্রশাসনিক নীতি ছিল বিকেন্দ্রীকরণ, আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা হ্রাস, জনগণের প্রশাসনে অংশগ্রহণ, গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনা, মহিলাদের ক্ষমতায়ন ইত্যাদি। গ্রামোন্নয়নে অনুঘটকের কাজ করে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা। 'কাজের বদলে খাদ্য' প্রকল্প চালু করে সর্বাধিক শ্রমদিবস সৃষ্টি করা হয়েছে।

দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী গ্রামবাসীদের সংখ্যা সর্বাধিক কমানো সম্ভব হয়েছে, ফলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গরিব পিছিয়ে থাকা মানুষের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছিল। কৃষির অভূতপূর্ব সাফল্য এসেছিল ভূমিসংস্কার ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে। ৬.৫ লক্ষের বেশি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন করে আর্থিকভাবে দুর্বল ৫৫ লক্ষ মহিলাকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। প্রাথমিক, অষ্টম শ্রেণীতে ড্রপ আউট কমানো, শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করা, মিড-ডে মিল চালু করা, বিনামূল্যে বই বিতরণ, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতিকরণ, একশো দিনের জবকার্ড বিলি ও সর্বোচ্চ শ্রমদিবস সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে রাজ্যের অর্থনীতিতে জোয়ার এসেছিল।

ভূমিসংস্কার ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে, বেকারের স্বপ্ন সফল করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে বড়, মাঝারি, ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। ভূমিসংস্কার, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণ, কৃষির উপর ভিত্তি করে শিল্পের বিকাশের মধ্যে দিয়ে রাজ্যের অর্থনীতিতে নতুন দিশার সৃষ্টি হয়েছিল।

২০১১ সালে মে মাসে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর ২০১২ সালে পঞ্চায়েতের দ্বিতীয় সংশোধনী এনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব কেড়ে নেওয়া হয়। আমলাদের পঞ্চায়েত পরিচালনায় দায়িত্ব দেওয়া হয়। উত্তর ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া জেলা পরিষদের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় জেলা শাসকদের হাতে। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। বিরোধীদের মুখে লিউকোপ্লাস্টার লাগানোর কথা বলা হয়। প্রতিবাদ করা, ভোটে দাঁড়ানো, ভোট দেওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। বিরোধী রাজনীতি করলে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা করা হয়। শ্রমিক, কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হলেও ধর্মঘট করলে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এক প্রশাসনিক সভার পর বলেন ''পঞ্চায়েত শাসকদলের হাতে না থাকলে কিভাবে কাজ হবে? অর্থাৎ কাজের জন্য পঞ্চায়েত দখল কর''।

তৃণমূল শাসনে প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচন (২০১৩) যাতে না করতে হয় তার জন্য আদালতে আইনী লড়াইতেও গিয়েছিল। অবশেষে ৫ দফা নির্বাচন ঘোষণা হলে নির্বাচনের আগেই আতঙ্ক সৃষ্টি করে ৫৩৫৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের আসন, ৮৯৭টি পঞ্চায়েত সমিতির আসন এবং ১৫টি জেলা পরিষদের আসন দখল করে নেয় তৃণমূল। বাকি আসনগুলির নির্বাচনে ব্যাপক ছাপ্পা, ভোট লুট, বুথ দখল, গণনা কেন্দ্র দখল করে ফলপ্রকাশের পর মুখ্যমন্ত্রী বললেন গণতন্ত্রের জয়। বিরোধীরা ত্রিস্তরে যেখানে জিতেছিল, গরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য ভয়ঙ্কর দল ভাঙ্গানোর প্রক্রিয়ার মধ্যে সন্ত্রাস ও প্রলোভনের সৃষ্টি করা হয়েছিল।

তৃণমূল শাসনে দ্বিতীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন হয় ১৪ মে, ২০১৮। রক্তক্ষয়ী পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছিল রাজ্য পুলিশ দিয়ে। এই নির্বাচনে ৪০ জন খুন হয়েছিলেন। প্রায় ২ কোটি গ্রামীন ভোটার ভোটদানের সুযোগ পাননি। প্রায় ৩৪.৩৭% আসনে (মোট ২০১৭৮টি) বিরোধী দলের প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিতে পারেননি। নির্বাচনের দিন বেপরোয়া ভোট লুট ও ভোট গণনা কেন্দ্রেও ছাপ্পার ঘটনা ক্যামেরায় ধরা পড়েছে।

পঞ্চায়েত এখন লুটেরা ও বাস্তুঘুঘুদের পঞ্চায়েতে পরিণত হয়েছে। তৃণমূল সরকারের সময়ে ২৩ হাজার একরের বেশি চাষযোগ্য পাট্টা জমি, বর্গা ও রায়তি জমির দখল কেড়ে নেওয়া হয়েছে। জমি থেকে উৎখাত করা আদিবাসীদের মন পেতে ব্লক স্তরে Three men Committee করা হয়েছে। লিজ হোল্ড জমিকে বিক্রী করার জন্য ফ্রি হোল্ড করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের হাতে থাকা ২০ হাজার একর জমি বর্তমান বাজারদরে খোলা বাজারে বিক্রী করবে তৃণমূল সরকার। আর্থিক অবস্থা খারাপ এই অজুহাতে সরকারি সম্পদ বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। আদানি গ্রুপকে জামালপুর ও বর্ধমান শহরের রাইসমিল বিক্রী করা হয়েছে।

কৃষি ক্ষেত্রে কর্পোরেটদের অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। কৃষি অলাভজনক হওয়ায় পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। কৃষক অভাবী মূল্যে ফসল বিক্রী করতে বাধ্য হচ্ছে। বাড়ছে বীজ, সার, বিদ্যুতের দাম, কমছে ফসলের দাম। রক্তশূন্য কৃষি অর্থনীতির ফলে কৃষকরা জমি বিক্রী করে দিচ্ছে আর তৃণমূলীরা জমি কিনছেন। বেসরকারী সমীক্ষায় বলছে রাজ্যে প্রায় ৮০% মানুষের অবস্থান দারিদ্রসীমার নীচে। রাজ্যে আয় ক্রমশ কমছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য অনুযায়ী বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে ৫.৭৬% থেকে কমে ৪.৯২% হয়েছে। দরিদ্রতম রাজ্যের তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ ১২ নম্বরে (২১.৪৩%), তিন ভাগের এক ভাগ পরিবারই (৩৩.৬%) অপুষ্টির শিকার। গ্রামীন কর্মসংস্থান প্রকল্প তৃণমূলের দুর্নীতির প্রকল্পে পরিণত হয়েছে। গরিবরা বঞ্চিত হচ্ছে। দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে এই প্রকল্পে টাকা বন্ধ করে দিয়েছে সরকার। সবার হাতে কাজ, সবার পেটে ভাত এবং বছরে

● পঞ্চম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে

যাহা ছাপান্ন তাহাই নবান্ন

প্রণব কর

গত ৭ জুন, ২০২৩ তারিখে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব আই এ এস রাজীব সিনহা। তার পরের দিনই অর্থাৎ ৮ জুন, ২০২৩ তারিখে তিনি ঘোষণা করেন যে রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে ৮ জুলাই এবং মনোনয়ন জমা শুরু হবে। ১৯ জুন থেকে। মনোনয়ন জমা দেবার শেষদিন ১৫ জুন, ২০২০।

ইতিমধ্যেই আমরা বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে দেখতে পেলাম কি অসম্ভব ক্ষুশান্তিপূর্ণ ভাবে বামফ্রন্ট, কংগ্রেস ও আই এস এফ-এর প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দেবার সুযোগ পেলেন। কোনো দর্শক যদি ভাঙ্গরের বিডিও অফিসের মনোনয়ন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে অতীব শান্তিপূর্ণভাবে বোমা, গুলি ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা দেখে ভেবে বসেন সে সাম্প্রতিক সুদানের গৃহযুদ্ধের কোনও ছবি দেখছেন তবে তাঁকে খুব একটা দোষারোপ করা যাবে না। ইতিমধ্যেই ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, মনোনয়ন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে। এই মৃত্যুমিছিল বন্ধ করার জন্য সমাজের গণতান্ত্রিক, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা সোচ্চার হয়েছেন।

বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে দেখা যাচ্ছে রাজ্য বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতৃত্ব ও বিধানসভার বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল কংগ্রেসের হিংসার রাজনীতির বিরুদ্ধে খুব গরম গরম বিবৃতি দিচ্ছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের সন্ত্রাস প্রতিরোধ করে বিজেপি রাজ্যে গণতান্ত্রিক বাতাবরণ ফিরিয়ে আনবে ইত্যাদি, ইত্যাদি দাবী তিনি রোজই সংবাদমাধ্যমের সামনে করে চলেছেন। এই রোমহর্ষক বিবৃতি শুনে অনেকেই স্মৃতিমেদুরতায় আক্রান্ত হয়ে ২০১৩ ও ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সমকালীন সময়ে ফিরে গিয়েছেন। ২০১৩ সালে রাজ্য পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঠিক আগে আগে বিরোধী দলের হাজারের ওপর পার্টি অফিসে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল, মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময়ে এবং নির্বাচনের দিন তীব্র হিংসা নামিয়ে আনা হয়েছিল রাজ্যের বিরোধী শক্তির ওপর। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার পঞ্চায়েত আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দখল করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। নির্বাচন পরবর্তীতে ভয়ভীতি দেখিয়ে দল ভাঙ্গিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ দখলের মূল কাণ্ডারী ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাস পূর্ববর্তী সব সন্ত্রাসকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহার করানো এবং সন্ত্রাসের মাধ্যমে মনোনয়ন জমা নেবার কেন্দ্রে না যেতে দেওয়ার মাধ্যমে ৩৪ শতাংশ আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দখল করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস দল। এসব ক্ষেত্রে তৃণমূলের সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন তৎকালীন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়। আজ যখন তাকেই গণতন্ত্রের পক্ষে সোচ্চার হতে দেখি তখন ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায় এই প্রবাদটা বড়ই মনে পরে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে আমরা বরং একটু বিজেপি শাসিত অন্যান্য রাজ্যে কেমন শান্তিপূর্ণ অবাধ নির্বাচন হয়েছে তার একটা হিসেব এখানে পেশ করি।

২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিজেপি শাসিত ত্রিপুরায় ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের উপনির্বাচনে ৯৬ শতাংশ আসনে কোনো বিরোধী প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিতে পারেনি। তারপরে ২০১৯ সালের ২৭ জুলাই ত্রিপুরায় ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের পূর্ণ নির্বাচন হয়। ১ জুলাই থেকে ৮ জুলাই মানোনয়ন জমা দেবার দিন ঠিক হয়েছিল। বামফ্রন্ট এবং অন্যান্য বিরোধী দলকে মনোনয়ন পত্র তোলা এবং জমা দেবার ক্ষেত্রে তীব্র সন্ত্রাসের মুখে পড়তে হয়। প্রতিটি মনোনয়ন কেন্দ্রে বিজেপির বাইক বাহিনী পাহারায় ছিল যাতে বিরোধীরা মনোনয়ন জমা দিতে না পারে। যে সামান্য কয়েকজন বিরোধী প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছিল তাদের থেকে একটা বড় অংশের প্রার্থীকে মনোনয়ন তুলে নিতে বাধ্য করা হয়। মনোনয়ন তোলার শেষ দিনে ১২১ জন বিরোধী প্রার্থী তাদের মনোনয়ন তুলে নিতে বাধ্য হন। ফলস্বরূপ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬,১১১টি আসনের মধ্যে মাত্র ৩০৬টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, পঞ্চায়েত সমিতিতে ৪১৯টি আসনের মধ্যে মাত্র ৫৬টি আসনে এবং জেলা পরিষদে ১১৬টি আসনের মধ্যে মাত্র ৬৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। সামগ্রিকভাবে ৮৬ শতাংশ আসনে বিরোধীরা কোনো প্রার্থীই দিতে পারেননি।

একইভাবে ২০২১ সালের জুলাই মাসে উত্তরপ্রদেশে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন সংঘটিত হয়। এখানে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল বিজেপি এবং সমাজবাদী পার্টির মধ্যে। উত্তরপ্রদেশে তিনটি স্তরে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয় গ্রাম পঞ্চায়েত, ক্ষেত্র পঞ্চায়েত এবং জেলা পঞ্চায়েত। দুটি পর্যায়ে ভোট হয়। প্রথম পর্যায়ের ভোটে ভোটদাতারা গ্রাম প্রধান এবং ক্ষেত্র পঞ্চায়েত এবং জেলা পঞ্চায়েতের সদস্যদের নির্বাচিত করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে, আগের পর্যায়ে নির্বাচিত সদস্যরা বিভিন্ন ক্ষেত্র পঞ্চায়েত এবং জেলা পঞ্চায়েতের প্রধানদের নির্বাচন করেন। সব মিলিয়ে আসন ২.২১ লক্ষ এবং প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৩.৩৩ লক্ষ। প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনে সমাজবাদী পার্টি ভালো ফল করে। ফলে দ্বিতীয় পর্যায়ে বিজেপি ভয়ংকর আক্রমণ নামিয়ে আনে। অন্ততপক্ষে ১৭টি জেলায় তীব্র মারদাঙ্গা চলে। সাংবাদিকদের ওপরে আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়। এমনকি পুলিশ পর্যন্ত আক্রান্ত হয় শাসক দলের মদতপুষ্ট গুণ্ডাদের দ্বারা। অন্তত দুটি ক্ষেত্রে মহিলা প্রার্থীদের শাড়ি খুলে নেওয়া হয়। ২০১৮ সালে খানাকুলে মহিলা প্রার্থীদের মারধর করে শাড়ি খুলে নিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতি বাহিনী। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রের মতো দ্রুত তা শিখে নিয়ে উত্তরপ্রদেশে প্রয়োগ করে বিজেপি।

ফলে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব এখানে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের বিরুদ্ধে যে সন্ত্রাস, ছাপ্পা, রিগিং-এর অভিযোগ করছে, তাদের দ্বারা শাসিত রাজ্যগুলিতে একই মডেল প্রয়োগ করে চলেছে বিজেপি। আসলে ভারত বর্তমানে বিশ্বের সবথেকে বৃহৎ স্বৈরাচারী গণতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি থাকবে, কিন্তু তার মধ্যে সারবত্তা কিছু থাকবে না। ভোট হবে, কিন্তু বিরোধীদের অংশগ্রহণ তীব্রভাবে সংকুচিত করতে হবে। যথেচ্ছ বলপ্রয়োগ চলবে গণতন্ত্রের নামে, ভোটদান এখন একটা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট-এ পর্যবসিত হয়েছে, যার ইভেন্ট ম্যানেজারেরা হলেন দুষ্কৃতি বাহিনী এবং কর্পোরেট মিডিয়া। নব্য-উদার অর্থনীতির বিশ্বায়নের মধ্য দিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে যে অতি-দক্ষিণপন্থী রাজনীতির রমরমা শুরু হয়েছে, সেই রাজনীতির মূল লক্ষ্যই হল মানুষকে দৈনন্দিন দিনযাপনের ক্ষেত্রে যে আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলির মুখোমুখী হতে হচ্ছে তাকে রাজনীতির আঙ্গিনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। তাই বিভিন্ন ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক ও পরিচিতি সত্ত্বার রাজনীতি আমদানী করে মানুষকে ছোট ছোট গন্ডিতে ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। তার সঙ্গে থাকছে সন্ত্রাস। আসলে সংকট থেকে বাঁচতে বিভিন্ন চেষ্টা সত্ত্বেও শাসকরা নিপীড়িত মানুষকে রুখতে পারছেন না, তাই সন্ত্রাসকেই শেষ অস্ত্র হিসেবে তুলে নিতে হচ্ছে শাসকশ্রেণীর মদতপুষ্ট রাজনৈতিক দলগুলিকে। রাজ্যের এবং কেন্দ্রের শাসকদলগুলি আসলে নব্য উদারনীতির তগ্বিবাহক-সামগ্রিকভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সঙ্গেই এদের খাড়াখাড়ি বিরোধ। এদের একটি অপরটির বিরোধী শক্তি বলে যা খাড়া করার চেষ্টা হচ্ছে তা আসলে একটি অলীক কুনাট্য। প্রকৃত গণতান্ত্রিক শক্তির বিস্তার লাভের মধ্যেই পশ্চিমবাংলার জনগণের এই ধ্বংস ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী শক্তিগুলির হাত থেকে মুক্তির পথ নিহিত রয়েছে। ❑

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য লড়াই

● *চতুর্থ পৃষ্ঠার পরে*

দুই লক্ষ বেকারের কাজ দেওয়ার ঘোষণা বেকার যুবকদের সাথে প্রতারণার সামিল।

শিক্ষা ব্যবস্থার হাল বেহাল। শিক্ষা দপ্তরের মাথারা আজ জেলে। শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। মিড-ডে মিলেও দুর্নীতি, রাজ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বিপুলভাবে কমছে, শিক্ষক অভাবে ক্লাস হয় না, ড্রপ আউট বাড়ছে, সরকারী/সরকার পোষিত স্কুল উঠে যাচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় ঢালাও বেসরকারীকরণের ব্যবস্থা করার জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ রাজ্যে চালু করা হয়েছে। স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। উদাহরণ, করোনা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে রাজ্য। নামেই স্বাস্থ্যসাথী, প্রচারের নামে বিপুল পরিমাণ অর্থ বেসরকারী হাসপাতালকে পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা। যদিও বর্তমানে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে পরিষেবা দিতে বেসরকারী হাসপাতালগুলি রাজী হচ্ছে না টাকা না পাওয়ার কারণে। সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হালও খারাপ। সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের নাম করে বড় বড় বিল্ডিংই শুধু তৈরী হচ্ছে। চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী ও আধুনিক চিকিৎসার যন্ত্রপাতির অভাব।

মূল্যবৃদ্ধি রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে রাজ্য সরকার। সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প বামফ্রন্ট সরকারের সময়েও ছিল। কিন্তু তৃণমূল সরকারের সময়ে হরেক নামে বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে শুধুই প্রচারের ঢক্কা নিনাদ। সামাজিক সুরক্ষা কারও দয়ার দান নয়, এটা অধিকার। মানুষের দেয় করে ছিটেফোঁটা কিছু দিয়ে ব্যাপক প্রচার করা হচ্ছে। পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থাকে রক্ষা করা, দুর্নীতিগ্রস্ত রাজ্য সরকারের মন্ত্রী, আমলা, শাসক দলের নেতাদের জেলযাত্রা, সাধারণ মানুষের সংকট বৃদ্ধি ও নব্যধনী, বাস্তুঘুঘুদের থেকে দৃষ্টি সরানোর জন্য এবং শ্রমজীবীদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করা হচ্ছে সুকৌশলে। জীবন-জীবিকার লড়াই বিপথগামী করার জন্য বিভিন্ন পথ গ্রহণ করা হচ্ছে। গঙ্গার ধারে প্রদীপ জ্বালানো, দীঘায় মন্দির নির্মাণ করা, ইসকনকে বিপুল জমি দেওয়া, ইমাম-মোয়াজ্জেম-পুরোহিত ভাতা, দুর্গাপুজায় ক্লাবগুলিকে বিপুল পরিমাণ টাকা দেওয়া। এরফলে রাজ্যে রামনবমী, হনুমান জয়ন্তী, নবী দিবসে দাঙ্গা সংগঠিত হচ্ছে। পাশাপাশি বাড়ছে রাজ্যভাগ করার মতো বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির দাপাদাপি। একে রুখতে সমস্ত গণতান্ত্রিক ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে একজোট হতে হবে।

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন আরও একটি দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হলো রাজ্য প্রশাসনে, শিক্ষাক্ষেত্র সহ বিভিন্ন স্তরের শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের উপর শোষণ, বঞ্চনা, অপমান পাহাড় প্রমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে তৃণমূল শাসনে। একদিকে শিল্পের শ্মশান, কর্মসংস্থানের মরুভূমিতে নেই রাজ্যের বাসিন্দা করা হয়েছে সংগঠিত ক্ষেত্রের এই শ্রমজীবীদের। অন্যদিকে এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যখন জোটবদ্ধ লড়াই গড়ে তোলা হচ্ছে তখন নামিয়ে আনা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা, এখানেই বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে তৃণমূল সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিগত তফাৎ। এর উপযুক্ত জবাব দিতে হবে।

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন হোক অধিকার পুনরুদ্ধারের লড়াই। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংগ্রামে নির্বাচকদের মতামত প্রদান করতে হবে। এই লড়াইকে শুধুমাত্র গ্রামীন উন্নয়নের লড়াই হিসেবে দেখলে হবে না। এ লড়াই লুটেরাদের হাত থেকে রাজ্যকে বাঁচানোর লড়াই, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচানোর লড়াই। নীতি পরিবর্তনের প্রাথমিক স্তরের এই লড়াইতে চেতনা সমৃদ্ধ সমস্ত অংশের শ্রমজীবীদের এগিয়ে আসতে হবে। ❑

যৌথ আন্দোলন ও আশু সংগ্রাম

● *প্রথম পৃষ্ঠার পরে*

জবরদস্তি বা বলপ্রয়োগের পদ্ধতি প্রাধান্য লাভ করেছে, তখন শ্রমিক আন্দোলনে সংকীর্ণতাবাদ, নৈরাজ্যবাদ প্রবল হয়ে উঠেছে। আবার যখন সুবিধাবাদ বা উদারনীতিবাদের পদ্ধতি প্রাধান্য পেয়েছে, তখন সুবিধাবাদ, সংস্কারবাদ প্রবল হয়ে উঠেছে এবং তা শ্রমিক আন্দোলানের পক্ষে আরও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই দুই প্রবণতা থাকাটাই স্বাভাবিক। শ্রেণি বিভক্ত সমাজে এমন অবস্থা অসম্ভব যেখানে সমস্ত স্তরের শ্রমজীবী মানুষ শোষণ-বঞ্চনা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য একই মত ও পথে বিশ্বাসী। এরকম অবস্থা থাকলে শ্রমজীবীমানুষের আন্দোলনের ক্ষেত্রে 'ঐক্যের' যেমন প্রশ্ন থাকতো না, তেমনি শাসক ও শোষক শ্রেণির পক্ষে টিকে থাকাও সম্ভব হত না।

তাই শ্রমজীবী মানুষের শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঐক্য অত্যন্ত ভারুরি বিষয় বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে তার প্রাসঙ্গিকতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ঐক্য গড়ার ক্ষেত্রে যে আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন সে সম্পর্কে কমরেড লেনিন বলেছেন, 'শ্রমিকের ঐক্য সত্যই আবশ্যক এবং সবচেয়ে আবশ্যক এটা বোঝা যে শ্রমিকরা নিজেরা ছাড়া আর কেউ ঐক্য দান করতে পারে না, তাদের ঐক্যে সাহায্য করার ক্ষমতা আর কারোরই নেই। ঐক্য প্রতিশ্রুতির ব্যাপার নয়;সেটা হবে ফাঁকা লড়াই, আত্মপ্রতারণা। বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর 'সম্মতি' থেকে 'ঐক্য সৃষ্টি করা যায় না। ঐক্য জয় করতে হালে একরোখা অধ্যবসায়ী পরিশ্রমে কেবল শ্রমিক নিজেরা, সচেতন শ্রমিকেরা নিজেরাই সেটা সাধন করতে সক্ষম। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অক্ষরে 'ঐক্য' কথাটা লেখা, আর আশ্বাস দেওয়া, নিজেকে ঐক্যের পক্ষপাতী বলে 'ঘোষণা করা'-এর চেয়ে সহজ আর কিছুই নেই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঐক্যকে অগ্রসর করা সম্ভব কেবল পরিশ্রম করে এবং অগ্রণী শ্রমিকদের, সমস্ত সচেতন শ্রমিকদের সংগঠন দিয়ে।'

শ্রম দাসত্ব থেকে মুক্তির সংগ্রামের অগ্রগতির পূর্বশর্ত যেমন শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য, তেমনি শাসকশ্রেণির অস্তিত্ব রক্ষায় শর্ত হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য ভাঙ্গা। তাই শ্রমিকশ্রেণি শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে যাতে ঐক্য গড়ে না ওঠে এবং সংগঠিত ঐক্যকে ধ্বংস করা যায় সে সম্পর্কে নানান কৌশল অবলম্বন করে। বর্তমান ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান অসংগঠিত শ্রমিক-কর্মচারীদের হাতিয়ার করে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে। কারণ আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে তৈরি হওয়া ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাবের বাইরে সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমিক-কর্মচারীদের বেশ কিছু অংশ রয়েছে। এসব অংশের ওপর সুবিধাবাদী, সংস্কারবাদী বা সরাসরি শাসকশ্রেণি স্পষ্ট ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাব রয়েছে। ফলত চিন্তা-চেতনা ও আন্দোলনের ধারার মধ্যে বিভিন্নতা আছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল বিপুল অসংগঠিত শ্রমিক-কর্মচারীর মধ্যে রয়েছে শাসকশ্রেণির আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করার প্রচণ্ড আগ্রহ।

আমাদের লক্ষ্য থাকবে এই সমগ্র অংশকে সংগ্রামের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করা এবং যে সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারী এখনও সুবিধাবাদী, সংস্কারবাদী বা দালাল ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাবে রয়েছেন তাদের স্বপক্ষে টেনে আনা।

যৌথ আন্দোলন মানে নীচুতলা থেকে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা রূপায়নের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থরক্ষা করা। যৌথ আন্দোলনের লক্ষ্য সম্পর্কে যদি অস্বচ্ছ ধারণা থাকে তা হলে দুটি ঝোঁক দেখা যায়। একটি সুবিধাবাদী ঝোঁক যাঁর প্রবক্তরা মনে করেন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের স্বার্থে যে কোন ইস্যুতেই আন্দোলন করা উচিত। অপরটি হচ্ছে সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁক, যার প্রবক্তরা মনে করেন সুবিধাবাদীদের সাথে কোন সময়েই যৌথ আন্দোলন করা উচিত নয়। এই দু'পক্ষের দৃষ্টি মূলত ওপরে ওপারে গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে চটজলদি সমাধানের লক্ষ্যে। তাই নীচতলার যে বিপুল সংখ্যক অসংগঠিত-কর্মচারী রয়েছে তাদের ঐক্যবদ্ধ করার গুরুত্বপূর্ণ কাজটি দৃষ্টির বাইরে থেকে যায়। যৌথ আন্দোলনের কৌশল মানে এটা বোঝায় না যে সমস্ত ধরনের নীতি আদর্শ বিসর্জন দিয়ে সংস্কারবাদী, সংশোধনবাদী বা দালালদের সাথে একত্রে ঝাঁপিয়ে পড়া। এক্ষেত্রে স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, সুবিধাবাদী এবং সংশোধনবাদী সংগঠনগুলির নেতারা কখনও চান না যে শ্রমজীবী মানুষ শ্রেণি সচেতন হোক, শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্রমাগত অগ্রগতি সম্পর্কে। কারণ তাঁরা সাধারণ স্বার্থের সংগ্রামের কথার আড়ালে শাসককূলের সেবা করে থাকেন, এবং প্রকৃতই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন যাতে গড়ে না ওঠে সেই চেষ্টা করেন। কয়েকটি দাবির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে উঠলেও সেই আন্দোলনের যৌক্তিকতা হারিয়ে যায়, যদি না সেই অর্থনৈতিক দাবির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে যুক্ত করা না যায়। শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনের সাথে সাধারণ জনগণের মধ্যে ঐক্যের প্রচণ্ড আগ্রহ রয়েছে। এই আগ্রহের প্রকাশ ঘটাতে পারলে এবং একে শক্তিশালী করে সক্রিয় শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারলেই সংশোধনবাদী এবং সুবিধাবাদী ঝোঁক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যুক্ত সংগ্রামে আসতে বাধ্য হবে। যৌথ আন্দোলনের ভিত্তিতে সর্বসম্মতিক্রমে শ্রমিক -কর্মচারীদের অর্থনৈতিক সংগ্রাম সর্বোপরি গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্য দিয়েই স্বৈরতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক বিভাজনের শক্তিকে পরাজিত করা সম্ভব। যৌথ সংগ্রাম গড়ে তোলার নীতি এবং কৌশলগুলি শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একমাত্র ধারালো হাতিয়ার।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হচ্ছে শোষণ। এটা সম্পর্কে শ্রমিক-কর্মচারীদের সচেতন করা যেমন আমাদের একটা কাজ তেমনি শ্রেণি সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়ে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসান ঘটানোও যেকোন সচেতন ট্রেড ইউনিয়নের প্রধান কাজ। একই সাথে হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি যারা শাসকশ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতা করছে যাদের বিভেদকামী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক বিভেদ তৈরি করে, তাদের ভূমিকাটাও উন্মুক্ত করা। আমাদের দায়িত্ব সব অংশের শ্রমজীবী মানুষের নয়া উদারনীতির ফলস্বরূপ দৈনন্দিন জ্বলন্ত সমস্যাবলী নিয়ে তীর সংগ্রাম ও আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রেণি সচেতনতা গড়ে তোলা ও আন্দোলন সংগ্রামকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ও হিন্দুত্ববাদী ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রামের সাথে যুক্ত করা। শ্রেণি ভাবাদর্শের উপর ভিত্তি করে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলা। এটা ঠিক যে ফ্যাসিবাদ কায়েম না হলেও ক্রমবর্ধমান তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটের বোঝা শ্রমজীবী মানুষের ওপর চাপানোর জন্য একের পর এক অর্জিত অধিকার হরণের পাশাপাশি প্রশাসনের অভ্যন্তরে এবং বাইরে থেকে যে ধরনের আক্রমণের ধারাকে সমাজ জীবনের সর্বদিকে সংহত করা হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত নিত্য নতুন কায়দায় সংহত করা হচ্ছে, তার সাথে ফ্যাসিস্ট আক্রমণের যথেষ্ট মিল রয়েছে। প্রশাসনিক স্তরে নানান আদেশনামা জারির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বোপরি সমাজের সর্বক্ষেত্রে অধিকার ও সামাজিক মূল্যবোধের উপর আক্রমণ আসলে ফ্যাসিস্ট সুলভ মতাদর্শের বৈশিষ্ট্য। তাই শুধুমাত্র কর্মচারী আন্দোলন নয়, পশ্চিমবাংলা তথা ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সামনে সমস্যা হচ্ছে ফ্যাসিস্ট সুলভ আক্রমণকে প্রতিহত করে সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এক্ষেত্রে বৃহত্তর ঐক্য গঠনের ক্ষেত্রে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি যৌথ আন্দোলনের কৌশল ও নীতি অনুসরণে আন্তরিক। কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে কর্মচারীদের আন্দোলন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে এগিয়েছে, শক্তিকে সংহত করেছে। ১৯৫৬ সাল থেকে নিতা ব্যবহার্য পণ্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান ঊর্ধ্বগতি আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ করে যৌথ আন্দোলনের মাধ্যমে তার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে Unity in action বলতে যা বোঝা যায় যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সমস্ত কর্মচারীদের অংশগ্রহণ করানো, সে ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা ঘাটতিও থাকছে। সেই ঘাটতি নিজেদের স্বার্থে তথা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্বার্থে অবিলম্বে পুরণ করা প্রয়োজন। এটাকে ভাসাভাসাভাবে না দেখে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রথমত, অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং সরকারের অনমনীয় মনোভাব সত্ত্বেও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করা সম্ভব এই মানসিক দৃঢ়তা তৈরি করা দরকার। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক মন্দা অবস্থা থেকে উত্তোরণে ব্যাপক শ্রমিক-কর্মচারী সঙ্কোচনের পথ অবলম্বন করা হচ্ছে, তা তুলে ধরা। তৃতীয়ত, কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া আদায়ের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব বর্তমান। পাশাপাশি অর্জিত অধিকারকে রক্ষা করাই অর্থনৈতিক সংগ্রামের পূর্বশর্ত সেটাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা। অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা, অর্জিত অধিকার রক্ষা শূন্যপদে স্বচ্ছতার সঙ্গে স্থায়ী নিয়োগ যার পূর্বশর্ত গণতান্ত্রিক বাতাবরণ প্রতিষ্ঠা করা; কোনটাই একক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সম্ভব নয়। বিশেষ করে বর্তমানে স্থায়ী চরিত্রের কর্মচারীর পরিবর্তে অস্থায়ী চরিত্রের কর্মচারীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান যারা ক্রমশ প্রশাসনের নিয়ন্ত্রক শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে তাদেরকে যুক্ত করে ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রয়োজন। এটা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে তুলে ধরা প্রয়োজন। আবার এটাও স্পষ্ট যে একটা অংশের মানুষের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিস্ত সুলভ আক্রমণকে প্রতিহত করা যায় না। সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষ, এমনকি বর্তমান সংগ্রামের ফলে যে সমস্ত নতুন নতুন কর্মচারী মোহ মুক্ত হয়ে সংগ্রামের ময়দানে সামিল হচ্ছেন, সেই সমস্ত মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই এই অবস্থা মোকাবিলা করার একমাত্র হাতিয়ার। তার মানে এই নয় যে, যুক্ত সংগ্রামের কৌশল মানে নীতিকে বিসর্জন দেওয়া। নীতির প্রতি অবিচল থেকে অপরাপর অংশকে আন্দোলন সংগ্রামে যুক্ত করা।

এই নীতির উপর দাঁড়িয়েই ঐক্যবদ্ধ সফল ধর্মঘট করার মধ্য দিয়ে কর্মচারী আন্দোলনের এক নতুন ইতিহাস রচিত হয়। এই ধর্মঘটে পশ্চিমবাংলার মধ্যবিত্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ অংশগ্রহণ অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে অতিক্রম করেছে। এই ব্যাপক সাফল্য অনেকের মনে পরিস্থিতির বিকাশ সম্পর্কে যে অস্পষ্ট ধারণা এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল তার অবসান ঘটিয়েছে। সন্ত্রাসজনিত প্রতিকূল পরিস্থিতির রাস্তা কেটে যখন সংগ্রাম ধাপে ধাপে অগ্রসর হয় তখন স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে না। সংগঠিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ততা তৈরি করতে হয়। তাই অতীতের ন্যায় কর্মচারীদের কাছ থেকে ধর্মঘট করার তাগিদ না এলেও এটা ধরে নেওয়া ঠিক হবে না যে কর্মচারীরা ধর্মঘটের মত বড় আন্দোলন করতে প্রস্তুত নয়। বরং উল্টোটাই প্রমাণিত হল। অর্থনৈতিক সঙ্কটে জর্জরিত কর্মচারীদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ রয়েছে। কিন্তু সন্ত্রাসজনিত পরিস্থিতির জন্য ক্ষোভের যথাযথ প্রকাশ ঘটানো সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু ক্ষোভের বারুদে নিমজ্জিত কর্মচারীদের কি ধরনের বিস্ফোরক আন্দোলন করতে হবে এ সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব জড়িত জটিল পরিস্থিতিতে সংগঠনকে সঠিক পথের দিশা দেখাতে হয়।

এই বার্তা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করে ব্লক স্তর থেকে কেন্দ্রীয় স্তর পর্যন্ত কর্মী বাহিনী অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে ধর্মঘটের প্রস্তুতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ৩ দফা দাবিতে বিরামহীন সংগঠিত প্রচেষ্টা কর্মচারীদের মধ্যে আস্থা ও নিজ শক্তির প্রতি আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছিল বলেই কোন বাধাই কর্মচারীদের কাছে ধর্মঘটে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। এর ফলে সম্ভব হয়েছে ধর্মঘটের এমন ব্যাপক সাফল্য। সম্ভব হয়েছে সন্ত্রাসের আবহাওয়াকে ছিন্নভিন্ন করে একধাপ অগ্রসর হওয়া। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি বৃহত্তর ঐক্যের জন্য নিরলস সংগঠিত তৎপরতা চালায়। শুধু সংগঠিত কর্মচারীরাই নয়, বিপুল সংখ্যক অসংগঠিত কর্মচারী, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তরে ছড়িয়ে থাকা ব্যাপক সংখ্যক কর্মচারী ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন।

পরিস্থিতির অভ্যন্তরে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর বিকাশ এবং অর্থনৈতিক গতিপথ সম্পর্কে, আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে অর্থনৈতিক দাবির সঙ্গে অধিকারগত এবং সাধারণ মানুষের মৌলিক দাবি অন্তর্ভুক্ত করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে, আন্দোলনের ব্যাপ্তি ঘটানো সম্পর্কে সর্বোপরি যৌথ আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি করে গণতান্ত্রিক বাতাবরণ

● *সপ্তম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে*

বাম জমানায় গ্রামীন সংখ্যালঘু জনগণ

* ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় তপসিলি জাতি, উপজাতি, সংখ্যালঘু সহ অন্যান্য পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়নের উপর। এই লক্ষ্যপূরণে জোড় দেওয়া হয়, তাঁদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উপর। এই অভিমুখেই রচিত হয় বিকেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। এই লক্ষ্য নিয়েই ১৯৭৮ সালে বাস্তুঘুঘুদের বাসা ভেঙে নতুন রূপে জনগণের পঞ্চায়েত তৈরী করা হয়।

* ১৯৭৮ সালে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় সংখ্যালঘুদের জন্য কোনও আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকলেও প্রায় ১৬ শতাংশ সংখ্যালঘু অংশের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। এটি পরে আরও বৃদ্ধি পেয়ে ২০ শতাংশে দাঁড়ায়। সংখ্যালঘু জনগণের অনেকেই জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মকর্তা নির্বাচিত হন।

* সাচার কমিটিরও বহু আগে ১৯৭৮ সালে কেন্দ্রে মোরারজি দেশাই সরকারের আমলে সংখ্যালঘু কমিশন গঠিত হয়েছিল। এই কমিশন তার প্রতিবেদনে মুসলিম জনগণের পশ্চাদপদতার করুণ চিত্র তুলে ধরে। ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হবার পর সংখ্যালঘুসহ তপশিলি জাতি উপজাতিদের অবস্থান সম্পর্কে অনুসন্ধানমূলক রিপোর্ট পেশ করার জন্য গোপাল সিংহের নেতৃত্বে যে কমিটি গঠন করেন সেই কমিটির অভিমত ছিল যে, সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে ঘাটতি তাদের মধ্যে বঞ্চনাবোধ তৈরী করেছে। এই বঞ্চনাবোধকে সমূলে উৎপাটিত করতে না পারলে তাঁদেরকে মূল স্রোতে আনা যাবে না। কমিটির মতে জাতীয় স্বার্থেই সংখ্যালঘু মুসলিমদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হবে। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের একই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল।

* যেহেতু রাজ্যের সংখ্যালঘু জনগণের বৃহত্তম অংশ গ্রামাঞ্চলে বাস করেন, তাই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পিত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল ভূমি সংস্কার কর্মসূচীর। রাজ্যের প্রায় ১২ লক্ষ একরের বেশি খাস জমি ৩০ লক্ষ ভূমিহীন ও গরীব কৃষকের মধ্যে বন্টিত হয়েছে। এরমধ্যে তপশিলি জাতি ও উপজাতি জনগণের অংশ ছিল ৪০%, এবং রাজ্যের ১৮%-এর বেশি গরীব ভূমিহীন মুসলিম জনগণ এই ভূমিসংস্কারে উপকৃত হয়েছিল। এছাড়া সেচ ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার, কৃষির আরও বৈচিত্র্যকরণ ইত্যাদির ফলে গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী সংখ্যালঘু জনগণের একটা বৃহৎ অংশ উপকৃত হয়েছিল।

* বামফ্রন্ট আমলে সর্বজনীন শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। বাম সরকার দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করে এবং বাংলা, হিন্দি, উর্দু ও নেপালী ভাষায় (পরে অলচিকি হরফে সাঁওতালি ভাষায়) পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করে তা ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিনামূল্যে পৌঁছে দেয়। রাজ্য সরকারের শিক্ষার প্রসারের এই কর্মসূচী রূপায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে রাজ্যে ইতিমধ্যেই চালু হওয়া জনগণের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে হাতিয়ার করে রাজ্য শিক্ষাদপ্তর বিদ্যালয়হীন গ্রামে নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। তেমনি সাক্ষরতা অভিযান এবং সকল শিশুকে বিদ্যালয়মুখী করার অভিযান পরিচালিত করে। ২০০১ সালে সর্বশিক্ষা অভিযান চালু হবার অনেক আগেই বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় বা শিশুশিক্ষা কেন্দ্র চালু করে। গ্রাম বাংলার সংখ্যালঘু প্রধান এলাকাগুলিতে এই ধরনের বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। সংখ্যালঘু পরিবারের বহু ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়মুখী হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন নীপা রিপোর্ট বলছে, জনসংখ্যার নিরীখে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলিম ছেলেমেয়েদের প্রাইমারী স্তরে লেখাপড়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছিল। ওই সময়ের তথ্য অনুযায়ী রাজ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ২৫%-এর কিছু বেশি। কিন্তু প্রাইমারিতে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মুসলিম ছিল ২৮%। উচ্চ প্রাথমিকে এই সংখ্যা ছিল ২০%। শিশু শিক্ষাকেন্দ্র, মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র এবং মাদ্রাসা শিক্ষাকেন্দ্রের মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের যুক্ত করলে দেখা যাবে, আমাদের রাজ্যে যত ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে তার প্রায় ৩৩% মুসলিম। যাদের বড় অংশটাই গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে। আর এটা সম্ভব হয়েছিল গ্রামাঞ্চলে জনমুখী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ছিল বলে। মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণ ও তাকে মাধ্যমিকের সমতুল মর্যাদা দেওয়ার জন্য মাদ্রাসাগুলিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি বেড়েছিল। সারা দেশে যেখানে ৩% মুসলিম ছেলেমেয়ে মাদ্রাসায় পড়ত আমাদের রাজ্যে তা ছিল ১৫%-এর উপরে। সাচার রিপোর্টে এর উল্লেখ আছে। বাম জমানায় মাদ্রাসার সংখ্যা ২৩৮ থেকে বেড়ে হয় ৬৩৬টি। যেগুলির বেশির ভাগই গ্রামাঞ্চলে তৈরী হয়েছিল। প্রচলিত মাদ্রাসাগুলির বাইরেও গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বহু মাদ্রাসা শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। বাম জমানার শেষ বছরে ২০১০ সালে ১০ লক্ষের বেশি ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসে, এদের মধ্যে মুসলিম ছিল ২ লক্ষ ১৫ হাজার ৭২২ জন (২২%), এর সাথে মাদ্রাসা ফাইনালের ৫০ হাজার যুক্ত করলে এই বার বেড়ে হবে ২৫.২৭%। এরমধ্যে মুসলিম ছেলে ছিল ৪৪%, মেয়ে ছিল ৫৬%, প্রসঙ্গত বলা যায়, তৃণমূল জমানায় এই বছরে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ৪ লক্ষ কমেছে।

* সরকারী চাকুরিতে মুসলিম জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি করতে বামফ্রন্ট সরকার রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের রিপোর্টকে ভিত্তি করে পশ্চাদপদতার নিরীখে মুসলিমদের জন্য ১০% সংরক্ষণ চালু করে। যা ছিল সারা ভারতে প্রথম। এর মাধ্যমে রাজ্যের মোট সংখ্যালঘু জনগণের ৮৮%-কে এই সংরক্ষণের আওতায় আনা হয়। এদের বৃহৎ অংশের বাস ছিল গ্রামাঞ্চলে, এই সময় রাজ্যে বিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষিকার ১১% ছিলেন মুসলিম। শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ও মাদ্রাসা শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে মোট শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রায় ৩৭% ছিলেন মুসলিম।

* বাম আমলে রাজ্যে ৩ লক্ষ মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। এরমধ্যে সংখ্যালঘু মুসলিম মহিলা ছিলেন ২০%। সংখ্যালঘু মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ৫০% ভর্তুকি দেওয়া হতো, যা আর কোন রাজ্যে ছিল না।

* রাজ্যে বাম সরকারের আমলে তৈরী হয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম। এই নিগমের মাধ্যমে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে সংখ্যালঘু পরিবারের বহু যুবক-যুবতীকে ঋণ ও ভর্তুকি দিয়ে স্বনির্ভর করে তোলার চেষ্টা হয়।

—মানস কুমার বড়ুয়া

নির্বাচন কমিশনকে ১২ই জুলাই কমিটির চিঠি

মাননীয় রাজ্য নির্বাচন কমিশনার,
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন,
১৮. সরোজিনী নাইডু সরণী (রডন স্ট্রীট)
কলকাতা-৭০০০১৭

বিষয় : আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং নির্বাচন কর্মীদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে

মহাশয়,

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে, নির্বাচকমণ্ডলীর সংবিধান স্বীকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করতে এবং নির্বাচন কর্মীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর বন্দোবস্ত সহ নির্বাচন কেন্দ্রীক সমস্ত দায়িত্ব প্রতিপালনের সুযোগ করে দিতে, নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা দরকার বলে শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষকদের যুক্ত আন্দোলন কমিটি ১২ই জুলাই কমিটি মনে করে। ৯ জুন থেকে মনোনয়ন পত্র জমা পড়ার কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রার্থীদের পাশাপাশি নির্বাচন কর্মীদের ওপরেও আক্রমণের ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। যা নির্বাচন কর্মীদের অপরাপর অংশের মধ্যে উদ্বেগ ও আশঙ্কা বৃদ্ধি করেছে।

এমতাবস্থায় অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচন পরিচালনার স্বার্থে অতি দ্রুত নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণের দাবি জানানো হচ্ছে—

১। পঞ্চায়েত নির্বাচনে মানুষ যাতে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারে, নির্বাচন কমিশনকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

২। অবাধ, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন পরিচালনার স্বার্থে রাজ্য পুলিশের নিরপেক্ষ ভূমিকার প্রতি নির্বাচন কমিশনকে প্রতিনিয়ত নজরদারি রাখতে হবে।

৩। দলমত নির্বিশেষে সমস্ত প্রার্থী, নির্বাচকমণ্ডলী এবং নির্বাচন কর্মীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রদানে রাজ্য পুলিশ ব্যর্থ হলে, দ্রুত বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি কমিশনকে রাখতে হবে।

৪। রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে কর্মী অপ্রতুলতার অজুহাতে সিভিক ভলান্টিয়ার্সদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যবহার করার প্রবণতা সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে।

৫। নির্বাচন কর্মীরা শারীরিক ও মানসিক হেনস্থার শিকার হলে, হামলাকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। নির্বাচন কেন্দ্র ও গণনা কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পানীয় জল, আলো, পরিচ্ছন্ন শৌচাগার ও বিশ্রাম কক্ষের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৭। বর্তমান বাজার দরের নিরিখে নির্বাচন কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও নির্বাচনের দিনের প্রাপ্য অর্থ বৃদ্ধি করতে হবে।

৮। নির্বাচন কর্মী হিসেবে কমিশন নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন কালে কোন দুর্ঘটনার শিকার হলে অথবা আক্রান্ত হলে, অতিদ্রুত প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান সহ আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আশাকরি রাজ্য নির্বাচন কমিশন উপরোক্ত পদক্ষেপগুলি গ্রহণের মাধ্যমে অবাধ, সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ পঞ্চায়েত নির্বাচন সুনিশ্চিত করবে।

ধন্যবাদ সহ

তারিখ : ১৩ জুন, ২০২৩

ভবদীয়

(সুমিত ভট্টাচার্য) (মনোজ সাউ)

(যুগ্ম আহ্বায়ক)

যৌথ আন্দোলন ও আশু সংগ্রাম

(ছয় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

তৈরি করা সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে কর্মচারী আন্দোলন কোন পথে এগোবে, কোনটা সঠিক পথ সে সম্পর্কে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অবস্থান সঠিক বলেই জন্মলগ্ন থেকেই আক্রমণ শুরু হয়েছে। সেই আক্রমণ এখনও বিদ্যমান।

পশ্চিমবাংলার মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনের প্রভাবে সারা দেশে যৌথ আন্দোলনের বাস্তবতা তৈরি হয়। এখানকার সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের শিক্ষাকে গ্রহণ করেই বিভিন্ন রাজ্যের সরকারী কর্মচারী সংগঠনগুলি তাদের যৌথ আন্দোলনের পরিধিকে শুধুমাত্র সরকারি, আধা সরকারী সংস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনি। বেসরকারী শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যেও সম্প্রসারিত করেছে। শ্রমিক-কর্মচারী যৌথ মোর্চা তৈরি হয়েছে।

বর্তমানে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে হিংস্র আক্রমণ নেমে আসছে সেক্ষেত্রে শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে Unity in action-কে জীবন্ত করে বাইরের আন্দোলনের সাথে সাযুজ্য রেখে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। এই পূর্বশর্ত হচ্ছে মিছিল, মিটিং, বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়ণের পাশাপাশি কর্মচারীর কাছে পৌঁছে তাদেরকে সদস্য করা। সাংগঠনিক কাজে যুক্ত করার মধ্য দিয়ে কর্মচারীদের চেতনাকে উন্নত করা। অনেক সময় আমরা এই প্রাথমিক পর্যায়ের কর্মসূচীগুলিকে যথাযথ গুরুত্ব না দিলেও সরকার কিন্তু প্রচণ্ড গুরুত্ব দিচ্ছে কারণ এরমধ্য দিয়েও যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। কর্মচারীরা যাতে প্রাথমিক পর্যায়ের কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে সংগঠিত হতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই প্রশাসনিক আক্রমণগুলি চালানো হচ্ছে। সুতরাং আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে ছোট-বড় যে কর্মসূচীই গ্রহণ করা হোক না কেন, তাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে রূপায়ণ করাই প্রাথমিক দায়িত্ব। যেকোন ধরনের আক্রমণের বিরুদ্ধে আন্দোলন জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারী তথা সমস্ত স্তরের শ্রমজীবী মানুষের অংগ্রহণের মধ্য দিয়ে। শ্রমিক-কর্মচারীর নিজস্ব অর্জিত অধিকার রক্ষার সংগ্রামের পূর্বশর্ত অধিকার রক্ষার গণতান্ত্রিক বাতাবরণ তৈরি করা।

পঞ্চায়েত স্তরে আসন্ন রাজনৈতিক সংগ্রামে গণতান্ত্রিক বাতাবরণ ফিরিয়ে আনার জন্য গ্রামীণ ক্ষেত্রে বসবাসকারী জনগণ জানকবুল লড়াই করে চলেছেন। কায়েমী স্বার্থে ব্যবহৃত পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে জনগণের পঞ্চায়েতে রূপান্তরিত করতে সমস্ত ধরনের ভয়-ভীতি-হুমকি-আক্রমণকে মোকাবিলা করতে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন। তারা গণতন্ত্র হরণকারী সমস্ত শক্তিকে প্রতিহত করে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নের ধারায় পুনরায় নির্ণায়ক ভূমিকা পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে পুনরায় মানুষের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার অর্থ গ্রামোন্নয়নের অধিকারকে ফিরিয়ে দেওয়া। বর্তমানে সম্মিলিত শ্লোগান গেঁথে যাচ্ছে মানুষের মনে, লুঠের পঞ্চায়েত ভাঙ্গো, মানুষের পঞ্চায়েত গড়ো। আগামী সংগ্রামের অভিমুখ সেই লক্ষ্যেই সূচিত হচ্ছে। ❑

Editor : MANAS KUMAR BARUA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
50th Year, 11 & 12th March-April 2023

Regd. No. : 18484/71

ইউক্রেন যুদ্ধের নয়—
রাজ্যের ২০১৮'র নবম পঞ্চায়েত নির্বাচনের খণ্ড চিত্র

৫ এপ্রিল রাজধানীতে শ্রমিক-কৃষক-খেতমজুরদের ঐতিহাসিক সমাবেশ

ক্ষোভের বিস্ফোরণ প্রত্যক্ষ করল গোটা দেশ প্রত্যাশা মতোই মেহনতীর প্লাবনে ভেসে গেল দিল্লীর রামলীলা ময়দানে। কেন্দ্রের মসনদে আসীন মোদি সরকারের বুকে কাপন ধরিয়ে ৫ এপ্রিল বুধবার লক্ষাধিক শ্রমিক-কৃষক-খেতমজুরের সমাবেশ প্রত্যক্ষ করল গোটা দেশের শ্রমজীবী মানুষ। এদিন সকাল থেকেই রাজধানীর রাজপথ ঢেকে গিয়েছিল হাজার হাজার লালপতাকার সুশৃঙ্খল মিছিলে। সমাবেশমুখী জনস্রোতে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীর কাছ থেকে কোহিমার খেটে খাওয়া জনতা হুঁশিয়ারী দিলেন কর্পোরেট সাম্প্রদায়িক নীতি মোকাবিলার এবং আরও জোরালো প্রতিরোধের। শ্রেণীর ঐক্য জোরদার করে দেশজুড়ে লাগাতার জোটবদ্ধ লড়াইয়ে পর্যুদস্ত করতেই হবে জনবিরোধী সরকারকে।

কেন্দ্রের বর্তমান বিজেপি সরকারের শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে এদিন দিল্লীর রামলীলা ময়দানে মজদুর কিষাণ সংঘর্ষ সমাবেশ ডাকা হয়েছিল। সেন্টার অব ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন (সিআইটিইউ) সারা ভারত কৃষক সভা (এআইকেএস) এবং সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়ন (এআইএডব্লুএ)-এর ডাকে এই যৌথ সমাবেশ দৃশ্যতই ঐতিহাসিক চেহারা নিয়েছিল। লাল পতাকা কাঁধে নিয়ে নিজেদের জীবন-যন্ত্রণার কথা জানাতে এদিন শিল্পাঞ্চলের মজদুরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমাবেশে এসেছেন খেত-খামারের অন্নদাতারা। গোটা দেশের মেহনতির জোটবদ্ধ বলিষ্ঠ প্রত্যয় নজর কেড়েছে দিল্লীবাসীর। গত ছ'মাসের টানা প্রচার আন্দোলনের পরে এই সমাবেশে সমস্বরে ধ্বনিত হয়েছে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিটি আক্রমণ প্রতিরোধের শপথ। সমাবেশে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সামিল হয়েছিলেন রাজ্য সরকারী কর্মচারীরাও। পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে প্রায় ছয় শতাধিক কর্মচারী হাজির হয়েছিলেন রামলীলা ময়দানে।

সিআইটিইউ-র সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কে হেমলতা ও তপন সেন, এ আই কে এস-র সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক অশোক ধাওয়ালে ও বিষ্ণু কৃষ্ণাণ, এআইএডব্লুইউ-র সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এ বিজয়রাঘবনের পাশাপাশি সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সর্বভারতীয় কৃষক নেতা হান্নান মোল্লা, বিপ্লব মজুমদার, নিরাপদ সর্দার প্রমুখ। এদিন শ্রমিক কর্মীদের ১২টি ফেডারেশন, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় কর্মী, ব্যাঙ্ক, বীমা, বিএসএনএল শ্রমিক-কর্মী সংগঠনের ৩১ জন প্রতিনিধি সমাবেশে ভাষণ দেন। সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের (AISGEF) পক্ষে বক্তব্য রাখেন সভাপতি সুভাষ লাম্বা।

এই সমাবেশের জন্য গঠিত অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রভাত পট্টনায়েক বলেন, এই তিন শ্রেণী যে এখানে উপস্থিত হয়ে নিজেদের দাবি সোচ্চারে তুলছে, এটাই মোদি সরকারের বিরুদ্ধে এক বড় চ্যালেঞ্জ। মোদী সরকারের লক্ষ্য এই শ্রমজীবীদের ভাগ করে রাখা। তাই তিন শ্রেণীর উপরে নয়া উদারনীতির হামলা চলছে দীর্ঘদিন। এর বিকল্প নীতি সম্ভব। যদি আমাদের দেশের সবচেয়ে ধনী ১%-এর ওপরে ২% সম্পদ

কর বসানো হয়, তাহলে সব ভারতবাসীকে পাঁচ অধিকার দেওয়া যায়। সকলের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা, বিনামূল্যে শিক্ষা, বিনামূল্যে চিকিৎসা, কম দামে আনাজ, বিপুল অংশের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। এখানে এই তিন শ্রেণীর মানুষ যে দাবি তুলেছেন তা-ই দেশের দাবি।

সভার শেষ বক্তা হিসাবে সিআইটিইউ-র সাধারণ সম্পাদক তপন সেন বলেন, যে উদ্দীপনা নিয়ে আপনার এখানে এসেছেন। সেই উদ্দীপনা নিয়েই ভূমিস্তরে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। দেশে পরিবর্তন চাই, কিন্তু কোন পথে সে পরিবর্তন হবে তা শ্রমিক কৃষক স্থির করবে। তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কতটা আক্রমণাত্মক হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবে তার ওপরেই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে। সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের (AISGEF) আহ্বানে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে মহিলা সহ ছয় শতাধিক কর্মী নেতৃত্ব বিভিন্ন জেলা/অঞ্চল, অন্তর্ভুক্ত সমিতির পক্ষ থেকে এই ঐতিহাসিক সমাবেশকে সফল করতে হাজির হয়েছিলেন। ❑

সম্পাদক : মানস কুমার বড়ুয়া
সহযোগী সম্পাদক : সুমন কান্তি নাগ

যোগাযোগ :
ই-মেল : sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪ থেকে প্রকাশিত এবং সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭২ হইতে মুদ্রিত।